পালাগানের আসর শীতের গ্রামীণ সন্ধ্যায় আজও ওম আনে

দার্জিলিং হারাতে বসেছে কমলালেবু পর্যটক

ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ওদলাবাড়ি ও সোনালি

এখন ডুয়ার্স

১-১৫ জানুয়ারি ২০১৮। ১২ টাকা

স্বাগত ২০১৮

ক্যালেন্ডার

পাঠকদের জন্য নতুন বছরের উপহার

স্বাগতম

2018

জলপাইগুড়ি পুরবাসীকে ইংরাজি নববর্ষের শুভেচ্ছা

নতুন বছরে জলপাইগুড়ি পুরবাসীর জন্য উপহার

গ্রীন সিটি

৭ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যায়ে শহরের সবুজায়ন ও সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে

এস ডবলু এম

প্রতিটি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের কাজ চলছে।

এর থেকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে।

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

সম্পাদকের ডুয়ার্স

নয়া সাল মুবারক
আবার ডুয়ার্স পৌঁছবে দিল্লিতে!

সত্তর ছুঁই ছুঁই জননেতা মিঠুদা সম্প্রতি কলকাতায় তাঁর প্রথম বইটির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে ঘোষণা করলেন, না অবসর নয়, আবার নতুন ইনিংস শুরু করতে চান তিনি। অগণিত গুণমুগ্ধদের সঙ্গে তাঁর গর্বিত কন্যারও ফেসবুকের পাতায় আপ্লুত আকাঙ্খা, প্রিয় পিতৃদেবের নতুন অধ্যায় গতিময় হয়ে উঠুক। মিঠুদার মতই ডুয়ার্স বাংলার মানুষও সবাই চাইছে এবার দিন বদলাক। মাথা তুলে দাঁড়াক এবার দীর্ঘদিনের বঞ্চিত ডুয়ার্স!

গত দশ-কুড়ি বছরে কিছুই কি বদলায়নি এই উত্তরে? অবশ্যই বদলেছে। বেহদ্দ সব গ্রামীণ রাস্তা পাকা হয়ে গিয়েছে, সে পথে সাইকেল চালিয়ে ঘরে ফিরছে স্কুল কন্যারা। রাজ্য সড়কগুলি আরও চওড়া মজবুত হচ্ছে, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে চলছে ফোর লেন হাইওয়ের কাজ। রেলপথেও এসেছে পরিবর্তন, জঙ্গলের পথে বন্ধ হয়েছে মালবাহী ট্রেন, নতুন পথে জেগে উঠেছে সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম-জনপদ। তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে নতুন মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, নতুন বেসরকারি হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ভিড় বেড়েছে বাগডোগরা বিমানবন্দরে, সারাদিনে অবিশ্বাস্যভাবে বহুগুণে বেড়েছে উড়ানের সংখ্যা। তৈরি হয়েছে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, চকচকে হয়েছে মহকুমা ও জেলা হাসপাতাল চত্বর পরিকাঠামো। পর্যটনেও ঘটেছে বিকাশ, জঙ্গল নদী চা-বাগানের ধার ঘেঁষে গড়ে উঠেছে সব রিসর্ট, লজ। সিজনে সেসব বোঝাই থাকে পর্যটকে, ট্রেনে ওয়েটিং লিস্টের বহর বেড়েই চলেছে।

এত কিছু সত্ত্বেও মনে হয় যেন এখনও অনেক কিছুই হওয়া বাকি রয়ে গিয়েছে বাংলার উত্তরে প্রত্যন্ত এই ভূখণ্ডে। একদিকে অভিবাসন বা অনুপ্রবেশের চাপে জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার জোগাড়, অন্যদিকে চলছে গণ নিষ্ক্রমণ। কর্মসংস্থান নেই, দলে দলে যুবক তরুণ শ্রমিক হতে ট্রেন বোঝাই পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে। অসংখ্য ডাক্তারের ভিড়, হাসপাতাল চত্বরে থিকথিক করছে মানুষ তবু সুচিকিৎস্যার আশায় দক্ষিণের ট্রেনে চাপা কমেনি এখানকার নিম্নবিত্ত মানুষের। গড়ে উঠছে নতুন নতুন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, তবু বাবা-মায়েরা সর্বস্ব ত্যাগ মেনেও সন্তানদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন অজানা অচেনা ভবিষ্যত তৈরির ঠিকানায়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে সংস্থানের পরেই আজকের মানুষের মনে যে মূল দুটি চাহিদা জাগে সেই শিক্ষা আর স্বাস্থ্য কি তবে বিদায় নিয়েছে? নাকি ঢোকেই নি কোনওদিন?

আজও কয়েকটি চালু রুট ছাড়া সন্ধ্যার পর বাস চলে না ডুয়ার্সের বহু রাস্তায়। তাই আজও এক জেলার খবর অন্য জেলার মানুষ রাখে না। যেমন বলুন তো চা-শিল্পের দুর্দশা নিয়ে চিন্তিত বা অবহিত বাকি ডুয়ার্স-তরাইয়ের কত শতাংশ মানুষ? চা বাগান নিয়ে আগাগোড়াই দূরত্ব থেকে গিয়েছে বাকি ডুয়ার্সের সমতলবাসীর। আজও কোচবিহারের বহু মানুষ সপরিবারে 'ডুয়ার্স' বেড়াতে যাওয়ার আগে দু'বার ভাবে, জলপাইগুড়ির বহু মানুষ আজও দেখেনি কুমারগ্রাম-কালচিনির চা-বাগান। আজও বহু মানুষের শিলিগুড়ি যাওয়া মানে হপ্তাখানেক আগে থেকে প্ল্যান! মাদারিহাটের কমলাভোগ, কামাখ্যাগুড়ির কালাকাঁদ, জামালদহের আমদই — এ সব ক'টিরই স্বাদ জানেন এমন মানুষ ক'জন পাবেন এই ডুয়ার্সে? পর্যটনের বিকাশই বা কীভাবে ঘটবে এই ডুয়ার্সে? সাড়ে তিনশো টাকা রেল ভাড়ায়কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি বা আলিপুরদুয়ার স্টেশন পৌঁছে ছোট্ট ছাপোষা পর্যটক পরিবার যেখানে ন্যুনতম দু'হাজার টাকার গাড়ি ভাড়া করা ছাড়া পৌঁছতে না পারে লাটাগুড়ি বা মাদারিহাট — সেখানে কীভাবে টুরিজমের 'বুম' আশা করে সরকার বা পর্যটন ব্যবসায়ীরা?

আসলে আমাদের কোনও দিকদর্শক নেই, কোনও নেতৃত্ব নেই সদর দপ্তরে নিজেদের অধিকার নিয়ে হুংকার দেওয়ার। আমাদের জনপ্রতিনিধিরা পদে বসেন স্ফীতির আকাঙ্খায়, অশান্তির চেয়ে ক্লীবত্ব তাঁদের অনেক বেশি পছন্দ। তাই কলকাতা থেকে আসেন দলের 'অবজার্ভার'রা, যাঁদের যোগ্যতা মাপার কেউ নেই, অথচ এখান থেকে কোনও 'অবজার্ভার' যান না ওদিকে। এ সময় মিঠুদার 'নতুন ইনিংস' ঘোষণা বুকে বল আনে—এইবার, এইবার বোধহয় আমরা আমাদের ডুয়ার্সের আওয়াজ পৌঁছে দিতে পারব দেশ জুড়ে। আর সেই ডাকে সাড়া দিতেই বোধহয় এসে গেল ২০১৮ সাল।

নতুন বছরে আরও মোহময়ী হয়ে উঠুক আমাদের ডুয়ার্স!

চতুর্থ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা,
১-১৫ জানুয়ারি ২০১৮

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ডুয়ার্সের চা-বাগান চিনুন ৬

তেস্তায় গলা ফাটছে পাহাড়-রাণির! ১২

পালাগানের আসর ১৯

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২৪

উত্তরপক্ষ ১৫

পর্যটন: জয় জয়ন্তী ২৬

ধারাবাহিক ডুয়ার্স

তরাই উৎরাই ৩২

ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩৪

শালবনে রক্তের দাগ ৩৭

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

খুচরো ডুয়ার্স ৪

ডুয়ার্সের ডিশ ২৫

ডুয়ার্সের ডায়েরি ৪২

ডুয়ার্সের হেথা হোথা ৪৫

সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪৬

প্রচ্ছদ ছবি: সব্যসাচী দত্ত

সম্পাদনা ও প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

টুরিস্টোত্তম

সব্বাই জানে যে তারা হলো টুরিস্টের টুরিস্ট। ল-ম্বা পথ পাড়ি দিয়ে বেড়াতে এসেছে ডুয়ার্সভূমে। প্রকৃতি তাদের জন্য উন্মুক্ত বাঙলো সে-ই কবে বুক করে রেখে দেয়। ফুরফুরে শীতে পালকের লেপ গায়ে দিয়ে স্নিগ্ধ সলিলে সন্তরণ করতে করতে দুটো প্রেমের কথা কইতেই না আসা! এক্কেবারে হলিডে মুড যাকে বলে! অথচ হতভাগা অর্বাচীন দোপেয়েদের কান্ডজ্ঞানের বহর দ্যাখো! সবে গার্লফ্রেন্ডের কানে রোমান্টিক গান গুণগুণ করার মুড এসেছে — ওমনি শব্দবজ্র বাজিয়ে দিল গো! পিকনিক করতে এসেছিস, ভালো কথা! তাই বলে আড়াই শো লিটার ফ্রিজের মাপের বাক্স লাগিয়ে ডলবি ডিজিটাল কামান দাগবি? অমন নারকীয় সুর শুনলে আমার বধূ ডিম পাড়বে কেমনে? অতঃপর বনবাবুদের আগমন এবং পিকনিক করা বন্ধ গাজলডোবা আর ফুলবাড়ি ব্যারেজে। টুরিস্টোত্তম পক্ষিদের পাগল হওয়া থেকে বাঁচানর জন্য আর কোনও বিকল্প নাই।

গুজুয়া

সে কী কত্তা? গুজুয়া জানেন না? গুজুয়া হলো গুজরাট নিয়ে জুয়া গো! মানে গুজরাটের বিধানসভার ফল নিয়ে জোর জুয়া খেলার গোপান আয়োজন নাকি হয়েছিল ময়নাগুড়িতে। বিজেপির পক্ষে মিলবে টাকায় একশো আশি পয়সা আর কংগ্রেসের পক্ষে দুশো পঞ্চাশ। গম্মেন্টের লোক অবশ্য বলছে যে এমন জুয়ার কোনও খবর নেই তাঁদের কাছে, কিন্তু অভিজ্ঞ পাব্লিকের দাবী, খবর আছে। ফিসফিস করে গোপনে খেলছে লোকে। হোয়াটস অ্যাপ থাকা মাস্ট। তারপর জায়গা মত ইন্টারেস্ট দেখালেই নাকি গুজুয়া গ্রুপের মেম্বার করে নেবে কেহ বা কাহারা। কিন্তু তাঁহারা কাহারা? ওই যে বললাম মামা! খুব ফিসফিস করে খেলা হচ্ছিল। তাই আর জানা হয়নি। তা ছাড়া এখন তো রেজাল্টে বেরিয়েই গেছে। পরের বার ভোট এলে দেখা যাবে 'খন।

মহাবিদ্বান

গেরস্তের রান্নাঘরে ঢুকতে পারলে চোরের কেল্লাফতে। কিন্তু রান্নাঘরটা আবার বেশ উঁচুতে। এরজন্য চাই মই। চোর এদিক সেদিক রেইকি চালিয়ে দেখল পাশের গেরস্তের উঠোনে চমৎকার একখান রয়েছে। রাতের আঁধার সে মই ঘাড়ে নিয়ে হিসেব করে লাগিয়ে এবার চোর উঠে গেল রান্নাঘরে। এবার গ্রিল কাটলেই চিচিং ফাঁক। ক-দিন আগেই আরেক গেরস্তের রান্নাঘর দিয়ে ঢুকে বিস্তর মালপত্র লাভ হয়েছিল দলের। রান্নাও করেছিল জমিয়ে। এ হেন 'চোরইভাতি' আবার হচ্ছে ভেবে খুব আপ্লুত মহাবিদ্বানরা। কিন্তু বাড়ির কত্তা ঠিকেদারবাবু যে বাড়িতে নাক ডাকছেন, এ খবরটা ঠিক জানা ছিল না। কাজের চাপে তাঁর রাতের ঘুমও খুব একটা জমজমাট নয়। তাই গ্রিল কাটতেই ঘুম কেটে গেল কত্তার। হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে আসতেই মহাবিদ্যার দৌড় শেষ। তখন মই ফেলে দৌড়। আলিপুরদুয়ারে নাকি ডক্টরেট করা মহাবিদ্বানরা এমনই কান্ড ঘটাচ্ছেন।

গুরুবাক্য

আরে, গুরু যে সেই কবে শরাবীর মাহাত্ম্য প্রচার করে গেয়ে গিয়েছিল 'নশে মে কৌন নেহি হ্যায় মুঝে বতাও জারা' —সে প্রশ্নের উত্তর পেলি? সে কারণেই কি পিকনিকে গিয়ে দু-চার ঢোঁক খেলে প্রশাসন উদাস থাকে না? তার চে' বেশি খেয়ে নিলে চুপচাপ বসে থাকাটাই ভালো নয় কি? এত্ত খচ্চা করে শরাব পান করে উপযুক্ত শরাবি'র মত আচরণ না করে লোকজনের কাটা ধানে মই দিতে যাস কেন? এই যে শুনলাম বক্সা লাগোয়ে পিকনিক স্পটে তোরা এমন ছড়িয়েছিস যে গুরু খেপে বেগুনি হয়ে গেছে। খেয়েছিস খা, তো ললনাকূল প্রত্যক্ষ করে টিজ করছিস কেন? শুনলুম এমন কুবাক্য বলছিস যে শুনলে বাইসন পর্যন্ত লজ্জায় ফর্সা হয়ে যাবে! দু-পাত্র খেলেই যদি মেমারি কার্ড কোরাপ্টেড হয়ে যায় তো ডাবের জল খেলেই পারিস! বীরত্ব দেখিয়ে তাতে বাঙলা মেশাস কেন? শান্তিতে পিকনিক করতে দে!

ডিয়ার-বাঘ

দার্শনিকরা প্রশ্ন তোলেন যে মানুষ বনে বসে বনভোজন করতে পারে কিন্তু বুনোদের

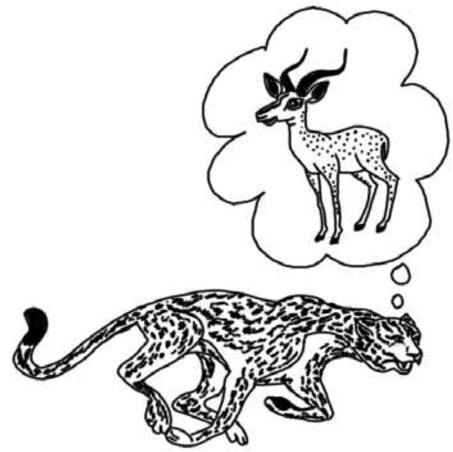

লোকালয়ে এসে লোকভোজনে ইচ্ছে হয় না। অথচ ডুয়ার্সের বড়ো বেড়ালরা কথায় কথায় পিকনিক করতে গেরস্তের উঠোনে চলে আসছে! এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা-চা-পান-চাপান-উতোর-প্রবন্ধ লিখন শেষে গম্মেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে জঙ্গলে তিয়াত্তরের মন্বন্তর সমাগত। অবিলম্বে খাদ্য না পাঠালে শীর্ণ-শুষ্ক চিতার দল 'ফ্যান দাও' থুড়ি 'রক্ত দাও' বলতে বলতে মিছিল করে বেরিয়ে আসবে এবং সে মিছিল গান্ধিবাদি হবে না বলেই মালুম। অতএব আনো হরিণ। চর্যাপদে তো বলেইছে যে 'অপনা মাঁসে হরিণা বৈরী'। সেই সূত্র মেনে একশো হরিণ এনে ছেড়ে দাও। সেটাই করা হয়েছে মহানন্দ রিজার্ভ ফরেস্টে। ডিয়ার বাঘাদের জন্য ডিয়ার। দরকারে আরো একশো দেওয়া হবে। কিন্তু একটা খটকা মামা থেকে গেলো! চিতাদের জন্য নয় একশো ডিয়ার আনা গেল, হাতিদের জন্য কি দু-হাজার গাছ আনা যাবে স্যার?

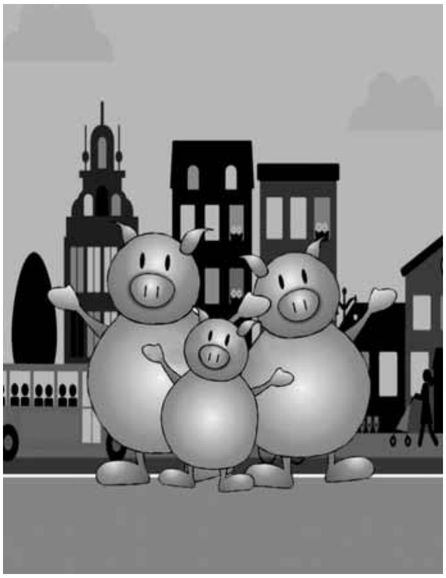

প্রভাব

টাউনের একটা শালিক পাখিও জানে যে জলপাইগুড়ি শহরে বরাহ পাকড়াও অভিযান নিয়ে আস্ত একখানা বায়োস্কোপ হতে পারে। অবতারদের গ্রেপ্তার করার জন্য সেনা নামাবার প্রস্তাবও নাকি দেওয়া হয়েছিল। কলরোলে-কোলাহলে নাকি তেতে বেগুনি হয়ে গেছিল পুরভবন। সব মিলিয়ে যেটা মোদ্দা কথা, তা হলো— বরাহরা আনগ্রেপ্তারেবল। টাউনের পরিবেশ এমন কিছু রয়েছে যা থেকে তেনারা বরাভয় পেয়ে থাকেন। তা জলপাইগুড়ি টাউন মানে তো বৈকুণ্ঠপুরের রাজধানী। রাজধানীর খবর হোয়াটস অ্যাপে নিশ্চই অরণ্যেও পৌঁছে গেছে। ফলে বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যের বুনো বরাহরা সদন্তে প্রকাশিত হয়ে লোকালয়ে রীতিমত হুলুস্থুলু ফেলে দিয়েছিল সেদিন। অনেক কসরৎ করে ব্যাটাকে জালবন্দী করে ফেরৎ পাঠিয়ে সব একটু চা-খেতে বসেছেন বনবাবুরা অমনি আরেকটা। না। সেটা বুনো নয়। কাছাকাছি ফার্মে থাকে। বুনোর কাছ থেকে বোধহয় টাউনের নিউজ পেয়েছিল। মহানন্দে বেরিয়ে পড়েছে! দেখিস বাপ! টাউন থেকে অরণ্যে গিয়ে বরাহরা আবার সংগঠন বাড়াচ্ছে না তো?

টুক্রাণু

রহিমাবাদ চা বাগানে পরলোকগত চিতা উদ্ধার এবং অনুমান ইহা আত্মহত্যা নহে। জলপাইগুড়িতে এনবিএসটিসি-র বাসে আগুন এবং ডিপোয় বাস ঢুকিয়ে ড্রাইভার বললেন 'ভাগুন'। পরিচয়পত্র ছাড়া গরুমারার গন্ডারেরা ভুটানেও বেড়াতে যাচ্ছে। বাঘমামার খোঁজে আরো সোয়া ডজন ক্যামেরা ন্যাওড়ারণ্যে। ক্রান্তির নর্দমা দিয়ে জলের বদলে বইছে প্লাস্টিক। দিনহাটার হল্ট স্টেশানে নাকি কেবল মাতাল লোকাল দাঁড়াচ্ছে। কোচবিহারে পথবাতিরা ঘুমিয়ে পড়ছে যদিও পুরপতি জানিয়েছেন অচিরেই সূর্যের চেয়ে হবে উজ্জ্বল। ছিটমহল এখনও 'ফিট মহল' না হওয়ায় শীতে তাপ বাড়ছে। কোহিনূর বাগানের অচলাবস্থা নাকি কোহিনূরের ইতিহাসের চাইতে জটিলাকার নিচ্ছে। মালবাজারে বালু-পাথর তোলা নিয়ে সিভিল ওয়ার। একবারে একশো হাতি রামশাই এলাকা পরিদর্শনে এসেছিল সেদিন। বিকেল গড়াতেই বাঘের ডাকে শুনশান রংটং গ্রাম। জঙ্গি খুঁড়তে সাধু বের হলো পাহাড়পুরে। বই না পেয়ে ঝামেলায় বানারহাটের পড়ুয়ারা যদিও সে সব পাস বই। ভগবানের উৎপাতে ভক্তের সংখ্যা কমছে লাটাগুড়ির মহাকালে। এবার গাছে ওঠার জন্য ওদলাবাড়ি বাছল অজগর। চোরদের চাপে ফেলে নাথুয়ার কাছাকাছি নতুন জোড়া পুলিশ ফাঁড়ি। ডুয়ার্সে আলু বাড়ন্ত। চোরেরা দিনহাটায় টি টোয়েন্টি ফর্মে ব্যাটিং করছে।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি)
৯৩৩২০০৫৮৬৫
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী ৯৭৪৯৭২৫৭৮১
লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি)
৯০০২৪০৯৮৯৩
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
শশাঙ্ক ৯০৪৬৬৯৫৬২৯
সুদীপ্ত (হোম ডেলিভারি)
৮৬০৯০৮৮৯০৭
কোচবিহার
সার্থক পণ্ডিত (হোম ডেলিভারি)
৭০০১২৬৩২৮৬
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
৯৮৫১২৩৪৮৮৯
মাথাভাঙা
নেপাল সাহা (হোম ডেলিভারি)
৮৯৬৭৯৯৫৮৮৭
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩
ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮
কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার **৪০৬৪৪০৯৭**

ডুয়ার্সের চা বাগান চিনুন

ডুয়ার্সের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েও বাকি পৃথিবী থেকে যেন আজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই রয়েছে ডুয়ার্সের চা জগৎ। খবরের কাগজে মাঝেমধ্যে চা-শ্রমিকের মৃত্যু সংবাদ, এ ছাড়া আর কেউ আজ জানতে পারে না সে জগতের খবর। বাইরের মানুষের কাছে, নতুন প্রজন্মের কাছে বিশাল এই চা-সাম্রাজ্যের ভূগোল নিয়ে কোনও ধারণাই নেই। 'এখন ডুয়ার্স' এর পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পাঠককুলকে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলি ধরে ধরে পরিচিত করবার। প্রতিটি বাগান ঘুরে তার সাম্প্রতিকতম পরিচিতি লিপিবদ্ধ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। এবারের পর্বে প্রতিবেদক ঘুরেছেন ওদলাবাড়ি ও সোনালি চা-বাগান। তুলে এনেছেন সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের কথা।

সময়টা ১৭৭৫ সাল। ভুটানে ব্রিটিশের প্রতিনিধি তখন জর্জ বোগলে। তিনি ডুয়ার্স সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, দুর্গম অস্বাস্থ্যকর এই এলাকা জয়ের কোনও দরকার নেই। এখানে লাভজনক কিছু করা যাবে না। সেই সময়ে জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল সাভানা ঘাসের তৃণভূমি। বাংলার এই অঞ্চল ছিল একেবারেই জনবিরল, সভ্য সমাজ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় উত্তরবাংলার এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলই ইংরেজ সরকারের কাছে হয়ে উঠেছিল সবুজ সোনার ক্ষেত্র। কারণ ১৮৭৪ সাল থেকেই এই অঞ্চলে চা শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৮৭৬ সালে গজলডোবাতে প্রথম চা বাগিচার পত্তন ঘটল। এর হাত ধরেই জলপাইগুড়ি জেলায় আদিবাসি সম্প্রদায়ের অভিবাসন ঘটে। বহু ভাষা, বর্ণ ও বিচিত্র সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষের মানচিত্রে জলপাইগুড়ি একটি উল্লেখযোগ্য নাম। হাজারো সৌরভের নানা বর্ণের সংমিশ্রণ ঘটেছে এই মাটিতে। বনপাহাড়ির সবুজে ঘেরা অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে ছড়িয়ে আছে নানা বর্ণ, নানা ভাষা, নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষজন। এদের মধ্যে আদিবাসিরা উল্লেখযোগ্য। জলপাইগুড়ির মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশ জুড়েই রয়েছে আদিবাসি জনসমাজ। আজও আদিবাসিরা মূল জনস্রোতের থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হলেও এদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক, জীবনযাত্রা, ধর্ম, চিন্তা সবকিছুই জলপাইগুড়ি তথা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিপূরক। উত্তরবঙ্গের উপজাতিদের মধ্যে বোড়ো, খাড়িয়া, ওরাওঁ, লিম্বু, লেপচা, মুন্ডা, লোহার, মাহালি, নেপালি, টোটো, মেচ, রাভা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সব আদিবাসি সংস্কৃতিরই একটা স্বাতন্ত্র্য থাকলেও প্রতিটি সংস্কৃতির মধ্যে কিছু মিলও খুঁজে পাওয়া যায়। এইরকমই একটি বহুজাতি সমন্বিত বহু ভাষার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা জনপদই ওদলাবাড়ি।

ওদলাবাড়ি

মালবাজার মহকুমার ওদলাবাড়ি টি গার্ডেনটির পরিচালক গোষ্ঠী দি ওদলাবাড়ি টি কোম্পানি। বাগানটি ডিবিআইটিএ-র সদস্য। বর্তমান কোম্পানি ১৯৭৭ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বাগানে মোট ম্যানেজেরিয়াল স্টাফ ১৪ জন। কোম্পানির মালিকের নাম অজয় নাহাটা। কোম্পানির ঠিকানা আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-১, কোম্পানির হেড অফিস কলকাতা। বাগানে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন ২টি। এগুলি হল ডিসিবিডব্লুউইউ, পিটিডব্লুউইউ।

ওদলাবাড়ি চা বাগানের আয়তন ৬২৩.৪১ হেক্টর। চাষযোগ্য আবাদিক্ষেত্র ৬২৩.৪১ হেক্টর। এক্সটেনডেড জমি নেই। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদিক্ষেত্র ৩১.৯ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ৪৮৪.১৮ হেক্টর। মোট চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদিক্ষেত্র ৪৮৪.১৮ হেক্টর। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত 'প্ল্যান্টেশন এরিয়া' থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ২৭৭৭ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়।

ওদলাবাড়ি চা বাগিচার সাব স্টাফের সংখ্যা ১০৮ জন। করণিক ১৩ জন।

ক্ল্যারিক্যাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফ ২৪ জন। বাগানে শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ৭৪৪ জন। মোট জনসংখ্যা ৬১৬৩। স্থায়ী শ্রমিক ৯০০ জন। এরা দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা তোলার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মজুরি পায়। বিগত আর্থিক বছরে অস্থায়ী শ্রমিক (বিঘাশ্রমিক) সংখ্যা ৮৪৬ জন। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত স্টাফ এবং শ্রমিক সংখ্যা ৩০০ জন। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংখ্যা ৪৩ জন। কম্পিউটার অপারেটর নেই। সর্বমোট সাব স্টাফ ১০৮ জন। ক্ল্যারিক্যাল, টেকনিক্যাল এবং স্থায়ী শ্রমিক মিলে মোট শ্রমিক সংখ্যা ৪৫। মোট কর্মরত শ্রমিক ১৩৯৬ জন। শ্রমিক নয় এমন সদস্যদের সংখ্যা ৪৭৬৭।

ওদলাবাড়ি চা বাগিচার নিজস্ব উৎপাদিত চা বছরে গড়ে ৫০ লাখ কেজি এবং ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চা বছরে গড়ে ১২.৫ লাখ কেজি। বহিরাগত বাগান থেকে সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা চা পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ গড়ে ২১ লাখ কেজি। ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত মোট বিক্রয়যোগ্য চায়ের পরিমাণ গড়ে ৩৫ লাখ কেজি। উৎপাদিত চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে সিটিসি এবং গ্রিন উভয় কোয়ালিটি চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চা ইনঅরগ্যানিক প্রকৃতির। ওদলাবাড়ি বাগানটি চরিত্রগত দিক থেকে অত্যন্ত উন্নতমানের এবং বৃহত্তর পরিকাঠামো যুক্ত।

> জলপাইগুড়ির মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশ জুড়েই রয়েছে আদিবাসি জনসমাজ। আজও আদিবাসিরা মূল জনস্রোতের থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হলেও এদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক, জীবনযাত্রা, ধর্ম, চিন্তা সবকিছুই জলপাইগুড়ি তথা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিপূরক। উত্তরবঙ্গের উপজাতিদের মধ্যে বোড়ো, খাড়িয়া, ওরাওঁ, লিম্বু, লেপচা, মুন্ডা, লোহার, মাহালি, নেপালি, টোটো, মেচ, রাভা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ডুয়ার্সের ভৌগোলিক অবস্থান যদি আমরা সার্ভে করি তাহলে আমরা দেখতে পাই ১৮৬৫ সালে ডুয়ার্স ছিল হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত সমতলক্ষেত্র। ভুটানের কাছ থেকে তিস্তা নদীর পূর্বপাড় ব্রিটিশরা দখল করে নেওয়াতে তাদের নবদখলিকৃত ভূমিতে চা বাগিচা রোপন করতে তাদের কোনও বেগ পেতে হয়নি। ডুয়ার্স কথাটির অর্থ ডোর বা দরজা। ডুয়ার্সে সেই সময়ে ১৮টি এই ধরনের দরজা বা যাতায়াতের পথ ছিল। তিস্তা নদী এবং সংকোশ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল ওয়েস্টার্ন বা পশ্চিম ডুয়ার্স যা ছিল জলপাইগুড়ির অন্তর্ভুক্ত। সংকোশ নদীর পূর্বপাড় ছিল আসামের মধ্যে যা পূর্ব ডুয়ার্স বা ইস্টার্ন ডুয়ার্স নামে পরিচিত ছিল। যা ছিল বাংলার অন্তর্ভুক্ত। ডুয়ার্স অঞ্চল সেই সময়ে সাধু এবং শয়তানদের আখড়া ছিল ইউরোপীয় শিল্পপতি, সাম্রাজ্যবাদী বা চা-করদের কাছে আকর্ষণবিহীন একখণ্ড জমিমাত্র যা অন্য কোনও কাজে লাগবে না। জলপাইগুড়ি তথা ডুয়ার্সের এই জঙ্গলময় বাগিচা অঞ্চল ছিল ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের ঘাঁটি। তাছাড়া উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত প্রবাহিত অসংখ্য নদী এবং

ওদলাবাড়ি চা-বাগানকে কেন্দ্র করে চা পর্যটনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে

ইকো পর্যটনের তীর্থভূমি গাজলডোবা ব্যারেজকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থান ঘটবে ডুয়ার্সে

ঝোড়াগুলি বর্ষাকালে তাদের গতিপথ পরিবর্তন ডুয়ার্সের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং মানুষের চলাচলের অগম্য। এই ভয়ংকর জঙ্গলে বিশাল বিশাল শাল, সেগুন, গামারি, চাপের দন্ডায়মান বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ অঞ্চল ছিল হিংস্র শ্বাপদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং গারো, মেচ, টোটো ইত্যাদি আদিম উপজাতিদের বাসভূমি।

ওদলাবাড়ি টি গার্ডেন এসজিআরওয়াই বা এমজিএনআরইজিএস-এর সুবিধা পায় না। ব্যাঙ্কের কাছে বাগানটি আর্থিকভাবে দায়বদ্ধ। আর্থিক সুবিধা প্রদানকারী ব্যাঙ্কের নাম ব্যাঙ্ক অব বরোদা। বাগান পরিচালনার কার্যকর মূলধন আসে ব্যাঙ্ক, নিজস্ব অর্থনৈতিক সোর্স, কোম্পানির হেড অফিস থেকে। বাগানটির লিজ হোল্ডার দি ওদলাবাড়ি কোং লিমিটেড। বর্তমান লিজের ভ্যালিডিটির সময়সীমা ২৪.০৫.২০০৬। বাগানটি লিজ রিনিউয়্যালের জন্য আবেদন করেছে।

ওদলাবাড়ি চা বাগানে আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত ইলেকট্রিক মিটারসহ পাকাবাড়ির সংখ্যা ৫৮৪। এখনও বৈদ্যুতিক সংযোগবিহীন শ্রমিক আবাসের সংখ্যা কম নয়। আধা পাকা বাড়ির সংখ্যা ১০৯। অন্যান্য বাড়ির সংখ্যা ৫৯। মোট শ্রমিক আবাস ৭৪৪। মোট শ্রমিক সংখ্যা ৯০০। বাগানে শতকরা ৫৩ শতাংশ শ্রমিক আবাস এবং

ইংরেজ কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৫ সালে সিকিমের মহারাজার কাছ থেকে দার্জিলিং অঞ্চলটি উপঢৌকন পেয়েছিলেন। আসলে সাগর পারের দেশের ইংরেজ বেনিয়ারা কলকাতা-মাদ্রাজ-মহীশূরের রুখাশুখা আবহাওয়ায় কাহিল হয়ে পড়েছিলেন সঙ্গত প্রাকৃতিক কারণেই। শীতের দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলটি লাভ করে জলবায়ু এবং পাহাড়ি প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে ১৮৩৫-১৮৫২ সালের মধ্যে প্রায় শতাধিক ইউরোপীয় পরিবার এবং ইউরোপীয় বণিকেরা যাঁরা ভারতে বাণিজ্য করতে আসতেন তাঁরা দার্জিলিংকে স্বাস্থ্যআবাস হিসাবে মান্যতা দিয়ে পাকাপাকিভাবে দার্জিলিঙে থাকতে লাগলেন।

অন্যান্য বাসগৃহ আছে। নতুন পাকা বাসগৃহের জন্য বাগানের বাৎসরিক গড় খরচ জানা যায়নি। সেমি পাকা বাসগৃহ থেকে পূর্ণাঙ্গ পাকা বাসগৃহে রূপান্তরিত করার জন্য বাৎসরিক গড় খরচও জানা যায়নি। শ্রমিক আবাস নির্মান, মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়বাবদ কোম্পানি পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে।

ওদলাবাড়ি চা বাগানে শৌচাগারের সংখ্যা ৬৯৩। বাগানে বৈদ্যুতিকরণের জন্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছে আবেদনের তারিখ জানা যায়নি। কোটেশন গৃহীত হওয়ার তারিখ জানা যায়নি। ব্যক্তিগত মিটারযুক্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া শ্রমিক আবাসগৃহের সংখ্যা ৬৮৫।

ওদলাবাড়ি চা বাগিচায় হাসপাতালের সংখ্যা ১টি। আলাদাভাবে পুরুষ/মহিলা/আইসোলেশন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা আছে। মেটারনিটি ওয়ার্ড আছে। মেল ওয়ার্ডের সংখ্যা ৬টি, ফিমেল ওয়ার্ড ১১টি, আইসোলেশন ওয়ার্ড ৪টি, মেটারনিটি ওয়ার্ড নেই। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার নেই। বাগিচায় অ্যাম্বুলেন্স আছে। বাইরে চিকিৎসার জন্য বছরে গড়ে ১৪০০ জন শ্রমিককে রেফার করা হয়। বাগিচায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে বাগিচায় ডাক্তার আছে ডাক্তারের নাম পি. রায়চৌধুরী। আবাসিক ভিত্তিতে তিনি বাগিচায় নিযুক্ত। শিক্ষাগত যোগ্যতা এমবিবিএস। নার্সের সংখ্যা ১। নার্সরা প্রশিক্ষিত। নার্সের সহযোগী আয়া বা সমতুল একজনও নেই। কম্পাউন্ডার ১ জন। স্বাস্থ্য সহযোগী নেই। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ হয় না। ওষুধের তালিকা স্টক অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয় না। উন্নত মানের পথ্য সরবরাহ করা হয়। নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরণ করা হয়। মেটারনিটির সুবিধা পাওয়া নারী শ্রমিকদের বাৎসরিক গড় ১৬ জন।

ওদলাবাড়ি চা বাগানে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নেই ২০১২ থেকে। বাগানে ক্যান্টিন আছে। ভর্তুকি দেওয়া হয় খাদ্যদ্রব্যের বা সামগ্রির দাম বোর্ডে দেওয়া হয়। বাগিচায় ক্রেশের সংখ্যা দুইটি। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা আছে। ক্রেশে শৌচাগার আছে। দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার ক্রেশের শিশুদের সরবরাহ করা হয়। ক্রেশে নিয়মিত পোশাক দেওয়া হয়। পানীয় জল পর্যাপ্ত পরিমাণ। পানীয় জলও সময়ে সময়ে ব্যবহারযোগ্য নয়। ক্রেশে মোট অ্যাটেনডেন্ট দুই জন। বাগিচায় সরকারি

প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বাগিচা সংলগ্ন উচ্চবিদ্যালয়ে আছে। বিদ্যালয়ের নাম ওদলাবাড়ি হাই স্কুল, বাংলা মাধ্যম স্কুল। শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নেওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। যানবাহনের সংখ্যা ২টি। একটি বাস এবং একটি ট্রাক। বাগানে বিনোদনমুলক ক্লাব আছে। খেলার মাঠও আছে।

ওদলাবাড়ি টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে প্রায় ৩০ লাখ টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড খাতে জমা পড়েছে। বিগত অর্থবর্ষে গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। বছরে গড়ে ১৪-১৫ জন শ্রমিক গ্র্যাচুইটি পেয়ে থাকেন। শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটির অর্থ বকেয়া থাকে না। প্রভিডেন্ড ফান্ড বকেয়া নেই। মজুরি চুক্তি অনুযায়ী দেওয়া হয়। শ্রমিকদের মজুরি বকেয়া নেই। রেশন বকেয়া নেই। শ্রমিকদের জ্বালানী, চপ্পল, ছাতা, কম্বল নিয়মিত সরবরাহ করা হয়।

১৮৭৯ সাল। গভর্ণরের বাসভবন এবং গ্রীষ্মকালীন রাজধানীর মর্যাদা পেল দার্জিলিং। ১৮৮১ সালে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে যাত্রী পরিবহনের জন্য গিয়েছিল খুলে। দার্জিলিঙে যাতায়াতের সুযোগ বেড়ে যাবার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা দার্জিলিঙে আসতে শুরু করেছিলেন পর্যটক হিসাবে। তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশের গভর্নর গ্রীষ্মকালে দার্জিলিঙে চলে আসতেন এবং উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারীদের একটা বৃহত্তর অংশ এখানে আসার ফলে ক্রমেই গুরুত্ব বাড়ছিল দার্জিলিঙের। পাশাপাশি বহু বাঙালি মনীষী তাঁর দ্বিতীয় কর্ম ও সাধনার স্থান হিসাবে দার্জিলিংকে বেছে নিয়েছিলেন। দার্জিলিং জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় ১৯০৭ সালে ১৩৮ বর্গ মাইল দার্জিলিং অঞ্চলে ১০ জন লেপচা বাস করত। আসলে ১৮৩৫ সালের পূর্বে দার্জিলিঙের অস্তিত্ব ছিল একটি জনবিরল বস্তি বা গ্রাম হিসাবেই স্বীকৃত। নেপালি ভাষায় বস্তি মানে পাড়া বোঝাতো। দার্জিলিং ছিল সিকিমের চোগিয়াল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বস্তি যা ১৮৩৫ সালে সিকিমের চোগিয়ালের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সেই সময় থেকেই দার্জিলিং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি এবং রাজশাহী বিভাগের অংশ।

হিমালয়ের সানুদেশ অঞ্চল ছিল তরাই। তরাই অঞ্চলের নাম ছিল মোরং। এর ছিল পূর্ব এবং পশ্চিম দুটি ভাগ। পূর্ব মোরং ছিল মেচি নদী থেকে মহানন্দার মধ্যবর্তী অঞ্চলব্যাপী দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চল। মধ্যযুগে এই অঞ্চলটি কোচরাজা নরনারায়ণের রাজ্যভুক্ত ছিল। পশ্চিম মোরং এর ঝাপা, ইলম কোচরাজা নরনারায়ণের ভাই বীর চিলা রায় দখল করেছিলেন। মোরং রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন মহারাজ নরনারায়ণ। বিবাহসূত্রে রাজপরিবারের রাজকন্যার ঘনিষ্ঠ কিছু মহিলা, পুরুষ কোচবিহারে এসে মাথাভাঙায় বসতি স্থাপন করেন। মাথাভাঙায় আজও আছে মোরদিঁয়া পাড়া। তরাই অঞ্চলের শাসনভার কলাক্রমে এসে ন্যস্ত হয় বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতদের ওপর। কিন্তু তারা এই অঞ্চলের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। সিকিম তরাইয়ের ওপর লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে দখল করে। এরপর ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধের সূত্রে সন্ধি হয় ইংরেজ ও নেপালের মধ্যে। ইংরেজ কোম্পানি প্রকৃতপক্ষে ১৮৩৫ সালে সিকিমের মহারাজার কাছ থেকে দার্জিলিং অঞ্চলটি উপঢৌকন পেয়েছিলেন। আসলে সাগর পারের দেশের ইংরেজ বেনিয়ারা কলকাতা-মাদ্রাজ-মহীশূরের রুখাশুখা আবহাওয়ায় কাহিল হয়ে পড়েছিলেন সঙ্গত প্রাকৃতিক কারণেই। শীতের দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলটি লাভ করে জলবায়ু এবং পাহাড়ি প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে ১৮৩৫-১৮৫২ সালের মধ্যে প্রায় শতাধিক ইউরোপীয় পরিবার এবং ইউরোপীয় বণিকেরা যাঁরা ভারতে বাণিজ্য করতে আসতেন তাঁরা দার্জিলিংকে স্বাস্থ্যআবাস হিসাবে মান্যতা দিয়ে পাকাপাকিভাবে দার্জিলিঙে থাকতে লাগলেন। দার্জিলিং তথা পার্বত্য অঞ্চলের আদিপর্বে কিন্তু কোনও নেপালির বাস ছিল না। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমেই কর্মসূত্রে দার্জিলিঙে আসেন বাঙালিরা। ইউরোপীয় বণিকদের পাশাপাশি ক্রমে চা বাগিচা শিল্পে বাঙালি উদ্যোগীরাও এগিয়ে এলে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হয়ে পড়ে 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ির' বাগিচাঞ্চল।

> একটার পর একটা বাগান সার্ভে করতে করতে এসে পৌঁছেছি সোনালি টি এস্টেটে। লিজ রিভার থেকে সেনাবাহিনীর ব্যারাক পার হয়ে চলছি তো চলছিই। জনমানবহীন প্রান্তর, দু'দিকে রুখাশুখা সবুজ চা গাছ। দেখলেই বোঝা যায় অযত্নের ছাপ। একটু ভয় ভয়ই লাগছে। কারণ গাড়ির ড্রাইভার আগেই বলেছিল জায়গাটা খুব একটা সুবিধার নয়।

আসলে এই মুহূর্তে সোনালি বাগিচায় সার্ভে করতে এসে ইউরোপীয় রাজকর্মচারী তথা চা-কর বা বণিকদের পাশাপাশি বাঙালিরাও যে শাসক এবং শোষক হিসাবে কম দক্ষ ছিল না সে কথা ভাবতে গিয়েই উপরের প্রসঙ্গের অবতারণা। আর এই প্রশ্নটি নিয়ে আমার পূজ্যপাদ মাস্টারমশাই আনন্দগোপাল ঘোষের সঙ্গে ক্ষেত্রসমীক্ষার নির্যাস আলাপচারিতার ফাঁকেই ইউরোপীয়দের পাশাপাশি দার্জিলিঙে বাঙালিদের একাংশের আগমনের প্রেক্ষিত বর্ণনা প্রসঙ্গেই স্বাভাবিকভাবেই বারে বারে ইতিহাসকে ফিরে দেখতেই হয়। কারণ আজকের সোনালি বা শওগাঁওকে অথবা পাথরঝোরা ও মানাবাড়িকে যদি তুল্যমূল্য আলোচনা না করি তাহলে ক্ষেত্রসমীক্ষার নির্যাস নিছক তথ্য পরিসংখ্যান নির্ভর হয়েই থাকবে যা কাম্য নয়।

সোনালি টি এস্টেট

মালবাজার মহকুমার সোনালি টি গার্ডেনটির পরিচালক গোষ্ঠী সোনালি টি এস্টেট। বাগানটি টিপা-এর সদস্য। বর্তমান কোম্পানি ১৯৭৮ সালে বাগানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বাগানে মোট ম্যানেজেরিয়াল স্টাফ ২ জন। কোম্পানির মালিকের নাম রাজেশ ঝুনঝুনওয়ালা। কোম্পানির ঠিকানা নিউ আলিপুর, কলকাতা। কোম্পানির হেড অফিস নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩। বাগানে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন ৩টি। এগুলি হল পিটিডব্লুউ, সিবিএমইউ, টিডিপিডব্লিউইউ।

সোনালি চা বাগানের আয়তন ৪২৬.২৯ হেক্টর। চাষযোগ্য আবাদিক্ষেত্র ৪২৬.৯২ হেক্টর। এক্সটেনডেড জমি নেই। আপরুটেড এবং নতুন বপনযোগ্য আবাদিক্ষেত্র ২০.৮ হেক্টর। ড্রেন এবং সেচের সুবিধাযুক্ত অঞ্চল ৬০ হেক্টর। মোট চাষযোগ্য উৎপাদনক্ষম আবাদিক্ষেত্র ২০৬.২ হেক্টর। প্রতি হেক্টর উৎপাদনযোগ্য এবং ড্রেন ও সেচযুক্ত 'প্ল্যান্টেশন এরিয়া' থেকে প্রতি হেক্টর জমি পিছু ৭৩১ কেজি করে চা উৎপাদিত হয়।

সোনালি চা বাগিচার সাব স্টাফের সংখ্যা ২২ জন। করণিক নেই। ক্ল্যারিকাল এবং টেকনিক্যাল স্টাফও নেই যেহেতু ফ্যাক্টরি নেই। বাগানে শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ২৯৬। মোট জনসংখ্যা ১৫০৯। স্থায়ী শ্রমিক ৩৩৪ জন। এরা দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা তোলার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মজুরি পায়। বিগত আর্থিক বছরে অস্থায়ী শ্রমিক (বিঘা শ্রমিক) সংখ্যা ছিল ৫ জন। ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত স্টাফ এবং শ্রমিক সংখ্যা ২২ জন। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নেই। কম্পিউটার অপারেটর নেই। সর্বমোট সাবস্টাফ ২২ জন। মোট কর্মরত শ্রমিক ৩৫৬ জন। শ্রমিক নয় এমন সদস্যদের সংখ্যা

১১৫৩।

এলেনবাড়ি, বাগরাকোট, ওয়াশাবাড়ি, লিজ রিভার, সোনালি বা শওগাঁও পাশাপাশি। একটার পর একটা বাগান সার্ভে করতে করতে এসে পৌঁছেছি সোনালি টি এস্টেটে। লিজ রিভার থেকে সেনাবাহিনীর ব্যারাক পার হয়ে চলছি তো চলছিই। জনমানবহীন প্রান্তর, দু'দিকে রুখাশুখা সবুজ চা গাছ। দেখলেই বোঝা যায় অযত্নের ছাপ। একটু ভয় ভয়ই লাগছে। কারণ গাড়ির ড্রাইভার আগেই বলেছিল জায়গাটা খুব একটা সুবিধার নয়। সোনালি বাগানের দক্ষিণে তিস্তা নদী। পূব দিক দিয়ে প্রবাহিত ঘিস আর পশ্চিম দিক দিয়ে লিস নদী। তিস্তা বাদে বাকি দুটি নামেই নদী। বর্ষাকালেই জলস্রোত। বছরের বাকি মাসগুলোতে শুকনো খটখটে। জলপাইগুড়ি-তথা উত্তরবঙ্গের সুপরিচিত ঘোষ পরিবার তিন পুরুষ ধরে চা বাগিচা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আদি পুরুষ গোপালচন্দ্র ঘোষের নাতি বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ পশ্চিম ডুয়ার্সে ব্রিটিশ কোম্পানির দুটো চা বাগান কিনে নিলেন যার একটা হাহাইপাতা এবং অপরটি গুডহোপ। এদের মোট আয়তন ছিল ১৬০০ একর। বাগরাকোট টি কোম্পানির আউট ডিভিশন হিসাবে ১৯৬০ সালে এই দুই বাগানের সঙ্গে যুক্ত হল ৫০০ একর চা আবাদি জমি বিশিষ্ট ফ্যাক্টরিবিহীন শওগাঁও টি এস্টেট। বাগানের মোট আয়তন কিন্তু ছিল ১১৭৩ একর। গোপালচন্দ্র ঘোষ ডুয়ার্সের বীরপাড়া এবং মাদারিহাটের মাঝামাঝি জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেন 'দ্য গ্রেট গোপালপুর টি কোম্পানি লিমিটেড'। চা বাগিচার নাম গোপালপুর টি এস্টেট। এই গ্রেট গোপালপুর টি কোম্পানি ডানকান ব্রাদার্স-এর কাছ থেকে দু' লক্ষ টাকায় শওগাঁও বাগানটি কিনে নেন। ১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বাগানের লোকসংখ্যা ছিল ১৩০০, স্থায়ী অস্থায়ী শ্রমিক সংখ্যা মিলিয়ে মোট শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৫০০। দু'-এক ঘর বাদ দিলে অধিকাংশ শ্রমিক ছিল ওরাওঁ সম্প্রদায়ভুক্ত।

বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ শওগাঁও বাগানটি কেনেন ১৯৫৫ সালে। সামান্য দামেই তিনি কিনেছিলেন। এখান থেকে কাঁচা চা পাতা তুলে ১০ কিমি দূরবর্তী মূল বাগানের বাগরাকোটের ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাওয়া হত। বড় মাপের চা বাগিচাগুলিতে কাজের সুবিধার্থে এই রকম ২-৩টি আউট ডিভিশন থাকত। এখনও অনেক চা বাগিচায় এরকম আউট ডিভিশন দেখা যায়। বীরেনবাবু শওগাঁও বাগান থেকে কাঁচা পাতা তুলে ট্রাকে করে ১৯ কিমি দূরবর্তী গুডহোপ এবং ২৫ কিমি দূরবর্তী হাহাইপাতা ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যেতেন। শওগাঁওতে ছিল একজন ম্যানেজার, অফিসে তিন-চার জন কর্মচারী নিয়ে অফিসঘর আর একটা দাওয়াইখানা। একজন ডাক্তার, একজন বাগানবাবু এবং বাকি সবাই ছিল শ্রমিক। বাগিচায় ছিল ১২৫ ঘর শ্রমিকের বাস। স্থায়ী শ্রমিক সংখ্যা ৩৪৮। অধিকাংশই নারী শ্রমিক। ছিল ৭টি শ্রমিক লাইন। শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ওরাওঁ সম্প্রদায়ের। শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য প্রদেয় সব শ্রমিক আবাস ছিল কাঁচা ঘরের। কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দ ছিল দুই এবং তিন কামরাওয়ালা কোয়ার্টার। বাগানে ছিল না বৈদ্যুতিক আলো। বাগানের পাতা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ কেজি।

বীরেন ঘোষ হাহাইপাতার বাগানের নাম রাখেন রূপালি আর শওগাঁও-এর নাম রাখেন সোনালি। দুই বাগানের নামকরণ তাঁর দুই মেয়ের নামে করেন। নতুন করে নাম জারি বা মিউটেশন কিন্তু করা হল না। মিউটেশন করতে গেলে সরকারি নিয়ম অনুসারে বকেয়া অর্থ মিটিয়ে দিয়ে লিজ নবীকরণ করতে হত। কিন্তু বীরেনবাবুরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি।

সোনালি চা বাগিচার ম্যানেজার নবেন্দু রায়ের কাছ থেকে পেলাম বাগানের সাম্প্রতিকতম তথ্য। বরাবরের মতোই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে বাগান। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসাবে কোচবিহার থেকে এসেছে তরুণ তুর্কী তথাগত দেবনাথ। তাঁদের কাছ থেকে জানা গেল সোনালি চা বাগিচার নিজস্ব উৎপাদিত চা ৭০-৭৫ হাজার কেজি। নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত হয় না বিক্রয়যোগ্য চা। বহিরাগত বাগান থেকে সংগৃহীত এবং কেনা কাঁচা চা পাতায় প্রস্তুত বিক্রয়যোগ্য চায়ের ক্ষেত্রেও নিজস্ব ফ্যাক্টরি না থাকার জন্য বহিরাগত ফ্যাক্টরির উপর নির্ভর করতে হয়। উৎপাদিত চায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাগানে সিটিসি চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চা গ্রিন লিফ প্রকৃতির। সোনালি চা বাগানটি চরিত্রগত দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল এবং পরিকাঠামোহীন চা বাগান। লিজ রিভার বাগানের লাগোয়া সোনালি বাগানের অতীতে যথেষ্টই সুনাম ছিল।

সোনালি চা-বাগানে প্রাইমারী স্কুল আছে, ছাত্র নেই। মাস্টার তো দূরের কথা

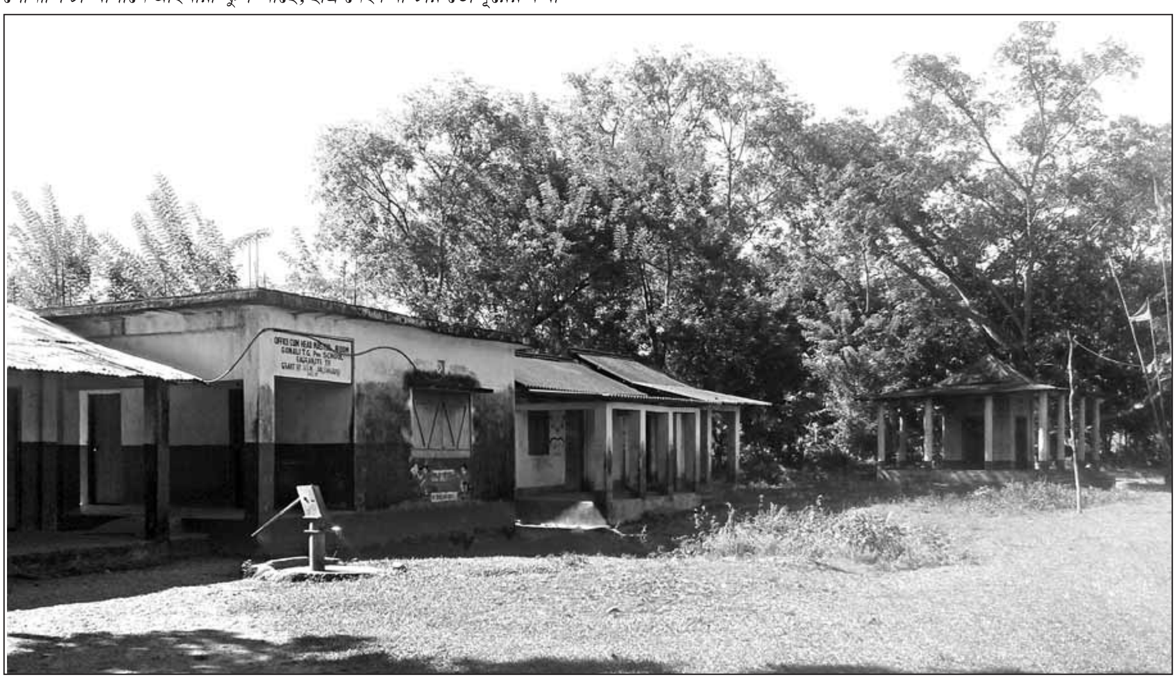

প্রাইমারী বিদ্যালয়ের এই মাঠেই গড়ে উঠেছিল চা-বাগানে প্রথম সমবায়

সোনালি টি গার্ডেন এসজিআরওয়াই বা এমজিএনআরইজিএস-এর সুবিধা পায় না। ব্যাঙ্কের কাছে বাগানটি দায়বদ্ধ নয়। বাগান পরিচালনায় কার্যকর মূলধন আসে নিজস্ব অর্থনৈতিক সোর্স এবং চা বিক্রি বাবদ আয় থেকে। বাগানটির লিজ হোল্ডার সোনালি টি এস্টেট। বর্তমান লিজের ভ্যালিডিটির সময়সীমা ২০৩৭।

সোনালি চা বাগানে আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত ইলেকট্রিক মিটারসহ পাকাবাড়ির সংখ্যা ৫১। এখনও বৈদ্যুতিক সংযোগবিহীন শ্রমিক আবাসের সংখ্যা ২৮। আধাপাকা বাড়ির সংখ্যা ২৩৫। অন্যান্য বাড়ির সংখ্যা ১০। মোট শ্রমিক আবাস ৩১৪। মোট শ্রমিক সংখ্যা ৩৫৬। বাগানে শতকরা ৮৮ শতাংশ শ্রমিক আবাস এবং অন্যান্য বাসগৃহ আছে। নতুন পাকা বাসগৃহের জন্য বাগানের বাৎসরিক গড় খরচ খুবই কম। সেমি পাকা বাসগৃহ থেকে পূর্ণাঙ্গ পাকা বাসগৃহে রূপান্তরিত করার জন্য বাৎসরিক গড় খরচ হয় না বললেই চলে। শ্রমিক আবাস নির্মাণ, মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণের বাৎসরিক গড় ব্যয় ২ লক্ষ টাকা মাত্র। সোনালি চা বাগিচায় বৈদ্যুতিকীকরণ হলেও সর্বস্তরে হয়নি। বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য আবেদন না করার কারণও জানা যায়নি। আর যদি করেও থাকে তাহলে বাগিচায় বৈদ্যুতিকীকরণের জন্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছে আবেদনের তারিখ জানা যায়নি।

সোনালি চা বাগিচা থেকে ফেরার আগে গেলাম বাগানের জরাজীর্ণ হাসপাতালে। সোনালি চা বাগিচায় হাসপাতালের সংখ্যা একটি। ডিসপেনসরি নেই। আলাদাভাবে পুরুষ/মহিলা/আইসোলেশন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা আছে। মেটারনিটি ওয়ার্ড আছে। মেল ওয়ার্ডের সংখ্যা একটি। ফিমেল ওয়ার্ড তিনটি, আইসোলেশন ওয়ার্ড নেই, মেটারনিটি নেই। বাগিচার হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটার নেই। বাগিচায় অ্যাম্বুলেন্স আছে। বাইরে চিকিৎসার জন্য গড়ে ৬৫ জন শ্রমিককে বছরে রেফার করা হয়। বাগিচায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। বাগিচায় ডাক্তার আছে। ডাক্তারের নাম উত্তম রাজবংশী। আবাসিক ভিত্তিতে তিনি বাগিচায় নিযুক্ত। শিক্ষাগত যোগ্যতা আরএমপি। প্রতিষ্ঠানের নাম অলটারনেটিভ মেডিসিন, কলকাতা। রেজিস্ট্রেশন নং ২৯৫৯৬। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত নয়।

> বীরেন ঘোষ হাহাইপাতার বাগানের নাম রাখেন রূপালি আর শওগাঁও-এর নাম রাখেন সোনালি। দুই বাগানের নামকরণ তাঁর দুই মেয়ের নামে করেন। নতুন করে নাম জারি বা মিউটেশন কিন্তু করা হল না। মিউটেশন করতে গেলে সরকারি নিয়ম অনুসারে বকেয়া অর্থ মিটিয়ে দিয়ে লিজ নবীকরণ করতে হত। কিন্তু বীরেনবাবুরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি।

নার্সের সহযোগী আয়া বা সমতুল এক জন। কম্পাউন্ডার একজন। স্বাস্থ্য সহযোগী নেই। বাগিচায় পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ হয় না। ওষুধের তালিকা স্টক অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া হয় না। উন্নত মানের পথ্য সরবরাহ করা হয় না। নিয়মিত ডায়েট চার্ট অনুসরণ করা হয় না। চা বাগিচার ম্যানেজমেন্ট লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নিয়োগ করেননি। বাগিচায় ক্যান্টিন নেই। ক্রেশের সংখ্যা মাত্র একটি। ক্রেশে শৌচাগার থাকলেও পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা নেই। ক্রেশের শিশুদের দুধ, বিস্কুট বা পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয় না, নিয়মিত পোশাক দেওয়া হয় না, পানীয় জল সময়ে সময়ে ব্যবহারযোগ্য নয়। ক্রেশে মোট অ্যাটেনডেন্ট ২ জন। বাগিচায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ১টি ট্রাকে করে সোনালি চা বাগিচার শ্রমিক সন্তানদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বাগিচায় খেলার মাঠ থাকলেও কোনও ক্লাবঘর করার অনুমতি প্রদান করেননি বাগিচা কর্তৃপক্ষ।

সোনালি টি গার্ডেনে বিগত অর্থবর্ষে কত টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমা পড়েছে তা যেমন জানা যায়নি, তেমনই গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ জানাতেও গড়িমসি করছে চা বাগান কর্তৃপক্ষ। বকেয়া প্রভিডেন্ড ফান্ড বা গ্র্যাচুইটির মোট অর্থের পরিমাণ জানা যায়নি।

তেষ্টায় গলা ফাটছে পাহাড়-রাণির!

এবার হারিয়ে যাবে কমলালেবু পর্যটক!!

রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের দাপট জারি থাকবে, কারণ তারা এখন সংখ্যায় ভারি। অতএব বন্ধ সন্ত্রাসের রাজনীতিও চালু থাকবেই পাহাড়ে, কম বা বেশি। দৈনিক পত্রিকার পাতায় খবরের ভিড়ে মৃত্যু বা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত জায়গা মেলে না মানুষের ব্যথা বা দুঃখের! শত যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট পাহাড়ের রাণি দার্জিলিং, একবার সৌন্দর্য হারালে শত প্রিয় হলেও মুখ ফিরিয়ে নিতে দেরি লাগবে না প্রেমিক পর্যটকের। এই নির্মম সত্য সাম্প্রতিক সফরে উপলব্ধি করেছেন আমাদের প্রতিবেদক — এসময় কালিম্পং ঘিরে গড়ে ওঠা প্রয়োজন বিকল্প পর্যটন সার্কিট।

খ্রিস্টমাসে পর্যটকের ঢল কি নামিলো দার্জিলিঙে? ডিসেম্বরের ২৩-২৪ পর্যন্ত হেলিয়া-দুলিয়া ৮০০ থেকে ১০০০, দার্জিলিং পৌঁছাইয়া দরাদরি করিয়া ঘর পাওয়া যাইতেছিল। কুয়াশা ঘেরা রোমান্টিক ম্যালে কতিপয় টুরিস্ট দেখিয়া ঘোড়ারা বিরক্ত হইয়া ল্যাজ নাড়াইতেছিল দরএবং নাক দিয়া 'ঘুরুং ঘুরুং' করিয়া আওয়াজ বাহির করিতেছিল। কাছে গিয়া কানে কানে জিজ্ঞাসা করিতে চোখ তুলিয়া বলিল 'ঘুউউউরুং, হতচ্ছাড়া ঘুরুং ঘুরুং'। ঘোড়ার মুখে খবর শুনিয়া খ্রিস্টমাসের স্বাদ চাখিতে উঁকি দিলাম গ্লেনারিস-এ। টুউউউউকিইই...

'পাম এবং খ্রিস্টমাস কেক, ব্র্যান্ডিসিক্ত কিসমিস এবং রকমারি পুডিং-এ এবার আমাদের বেশি মনোযোগ। পর্যটক সমাগম হয়েছে কিন্তু আগের বারের মতো নয়। গতবছর তো শেষমেশ দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে দিতে হয়েছিল', গ্লেনারিস মালিক অজয় এডওয়ার্ড-এর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আরও দু'জন হোটেল মালিকের সঙ্গে আলাপ হল। দু'জনেই একসময় গাড়ি চালাতেন। নাম পরিচয় প্রকাশ করব না এই আশ্বাসে এক্কেবারে দিল খুলে কথার তুবড়ি। 'শুনুন, ডুয়ার্স আর পাহাড় নিয়ে সব্বাই শুধু আশ্বাস আর বাতেলা দিয়েছে। প্রতিদিনের প্রয়োজন নিয়ে স্থানীয় উন্নয়ন এবং ভূ-প্রকৃতিকে মাথায় রেখে পর্যটন পরিকল্পনা কেউ করেনি। যদি সদিচ্ছা থাকত তাহলে পাহাড়ে এত বড়বড় শপিং মল বা হোটেল-বহুতল হত! কে দিয়েছে অনুমতি? পরিকল্পনাহীন হাজার হাজার ঘরবাড়ি আর মানুষ। যে কোনও দিন বিরাট ধ্বসে তলিয়ে যাবে গোটা শহর, পর্যটকসহ স্থানীয় বাসিন্দারা। সমতলে তো শিক্ষিত মানুষের অভাব নেই। আমার-আপনার করের পয়সায় একটি 'পলিউশান কন্ট্রোল বোর্ড' আছে। তারা কী করে বলতে পারেন? ঘোড়ার ডিম পারে?'

কথা বলতে বলতে খেয়াল করিনি কখন যেন একটি কুকুর এসে জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে। হয়ত জলতেষ্টা পেয়েছে! আমি একজনের হাত থেকে জলের বোতল নিয়ে কুকুরটিকে দেবার আগেই উনি ছিনিয়ে নিয়ে বললেন— কুকুর নিয়ে পরে ভাববো। মানুষ এখানে জল না পেয়ে মরছে। আমি হতভম্ব! ঘুম এলাকার সেঞ্চলে ব্রিটিশরা দুটো লেক তৈরি করেছিল, ১৫০০০ হাজার মানুষের কথা ভেবে। তখন দার্জিলিঙের জনসংখ্যা ছিল দশ হাজার। এখন উনিশ লক্ষ (১৮,৪৬, ৮২৫- জনগণনা ২০১১) বাসিন্দা এবং সুদিনে পর্যটকের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ হাজার। যদিও ব্রিটিশ আমলের পর পানযোগ্য জলের ভাঁড়ার বাড়েনি। যা হয়েছে তাতে তেষ্টা মেটেনা। সক্রিয় অসাধু ব্যবসায়ীদের পাইপের জাল মাকড়শার মতো ছড়িয়ে আছে দার্জিলিং, মিরিক, কার্শিয়াং আর কালিম্পঙে। সাধারণ মানুষের জন্য জল পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঘুরপথে পাইপলাইনে পরিচালিত করা হচ্ছে পয়সার বিনিময়ে।

এই অবহেলার সুযোগ নিয়েছে বিমল গুরুঙের মতো লোকজনেরা। ওরা-ও এখন আর উন্নয়ন বা মানুষের কথা বলে না। শুধু নেপালি জনসত্তা নিয়ে বাতেলা দেয়। ওসব ধুয়ে কি জল খাব আমরা? গুরুং বা হরকা বাহাদুরের মতো পয়সা সবার নেই। আমরা চাই পাহাড়ে পর্যটন হোক, সবাই ডালভাত পাক।

আমার হা হয়ে যাওয়া ভ্যাবাচ্যাকা মুখমণ্ডল দেখেই বোধহয় আমার ভাবনা কেড়ে নিয়ে অনুজ তামাং (নাম পরিবর্তিত) বলে উঠলেন, এই অবহেলার সুযোগ নিয়েছে বিমল গুরুঙের মতো লোকজনেরা। ওরা-ও এখন আর উন্নয়ন বা মানুষের কথা বলে না। শুধু নেপালি জনসত্তা নিয়ে বাতেলা দেয়। ওসব ধুয়ে কি জল খাব আমরা? গুরুং বা হরকা বাহাদুরের মতো পয়সা সবার নেই।

আমরা চাই পাহাড়ে পর্যটন হোক, সবাই ডালভাত পাক। অনুজরা ঠিক বলছেন কিন্তু সবার আগে যে পাহাড়কে বাঁচাতে হবে প্রকৃতির কথা মাথায় রেখে। দার্জিলিং আর ভার সইতে পারছে না, আজই হোক বা কাল, সে ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। পাহাড়ের রাণিকে নিয়েই তো মূল লড়াই, রাণিসাহেবার কিছু হয়ে গেলে আমি বা আপনি খেয়ে বাঁচব কী করে? আজকের পর্যটন মানেই তো টেঁকসই পর্যটন, তার জন্যই তো বিশ্বজুড়ে চলছে এত ভাবনাচিন্তা! প্রকৃতি থাকলেই তো আমরা থাকব, আমাদের সন্তানরা বেঁচে থাকবে! ঠিক ঠিক, ঘনঘন মাথা নাড়ে ততক্ষণে জড়ো হয়ে যাওয়া সবাই। যতক্ষণ না দার্জিলিঙের নিকাশি, পানীয় জল এবং নগর উন্নয়ন নিয়ে সুপরিকল্পিত পরিকাঠামো তৈরি না হচ্ছে ততক্ষণ বিকল্প হিসেবে গড়ে তুলতে হবে কালিম্পংসহ ডুয়ার্সকেই। আর সেটা করতে হবে সরকারকেই! সে কাজ আমি আপনি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতায় পারব না।

—হ্যাঁ, সেটাই হবে আগামী দিনে। শুরু হয়েও গিয়েছে। ঘিসিং পাল্টে গুরুং, গুরুং পাল্টে তামাং, এসব আদৌ কোনও সমাধান নয়! তারপর কলকাতাসহ অন্যান্য বড় শহর বা বিদেশ থেকে দার্জিলিঙের মতো একটা কংক্রিটের জঙ্গলে কেন আসবে মানুষ। নীতিগতভাবে পর্যটনবিরোধী গুরুংদের জন্য সন্ত্রস্ত মানুষ মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে দার্জিলিং

যতক্ষণ না দার্জিলিঙের নিকাশি, পানীয় জল এবং নগর উন্নয়ন নিয়ে সুপরিকল্পিত পরিকাঠামো তৈরি না হচ্ছে ততক্ষণ বিকল্প হিসেবে গড়ে তুলতে হবে কালিম্পংসহ ডুয়ার্সকেই। আর সেটা করতে হবে সরকারকেই!

থেকে। বড়দিনের হপ্তাখানেকের ভীড় তো যে কোনও টুরিস্ট স্পটেই হয়।

আড্ডা দিতে দিতে সামতেং লামার (নাম পরিবর্তিত) জিপে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম তাকদা। এই গ্রামেই ব্রিটিশ আমলে বানানো হেরিটেজ ফরেস্ট বাংলো পুড়িয়ে দিয়েছিল গুরুংরা। ২০১৩ সাল। কারা পুড়িয়েছে? ভয়ে এ প্রশ্নের উত্তর সেদিন দিতে পারেনি প্রতিমা রাইয়ের পরিবার। যারা বংশ পরম্পরায় দেখভাল করতেন এই হেরিটেজ বাংলোর। সময় বদলেছে। ঘুরে দাঁড়িয়েছে তাকদা-র মানুষ। অরাজনৈতিক সংগঠন জনকল্যাণ সমন্বয় সমিতির পক্ষে গোবিন্দ প্রধান এবং এ.কে.রাই মাস পিটিশন জমা দিয়েছেন দার্জিলিঙের ডিএম-এর কাছে। এলাকার সমস্ত মানুষ চান, ১০ নং জাতীয় সড়ক ও দার্জিলিঙের সঙ্গে তাকদার প্রধান সংযোগকারী রাস্তার দায়িত্ব পিডব্লুইডি গ্রহণ করুক। এখন এই রাস্তা জিটিএ-র অধীন। অনেক গল্প আড্ডা এবং মোমো-থুপ্পা শেষ করে উঠলাম। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। যাব ৩৬ কিমি দূরে তিস্তা পেরিয়ে সিনক্লেয়ার্স রিট্রিট কালিম্পং। পাহাড়ে এসে বিলাসিতায় থাকতে চাইলে এখানে আসতেই হবে। চারিদিকে সবুজ আর পাহাড়। কিন্তু হোটেলের ভিতরে নাগরিক জীবনের সব উপকরণ তৈরি।

গাড়িতে এবার আমার সঙ্গী কালিম্পঙের ডিনা লামা আর প্রভীন মোক্তান। পাহাড়ি রাস্তায় চিতাবাঘের মতো ক্ষিপ্রতায় গাড়ি চালায় ডিনা। অন্ধকারে ওর চোখ যেন জ্বলতে থাকে। ডিনার বংশপরম্পরায় জামাকাপড়ের ব্যবসা। পড়াশোনা কালিম্পঙেই। বয়স ২৯। প্রভীনের বয়স ৩২। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা। বসবাস কালিম্পঙে। পেশায় ব্যবসায়ী। ওর স্বপ্ন ঝকঝকে তকতকে একটা গ্রামীণ পর্যটন। গণ পর্যটন নয় আবার লাউ-বিউলির বড়ি-পোনামাছ আর চাটাইয়ের আঁতলামিও নয়। ও যা করতে চায় তার জন্য বিদেশের উদাহরণ নয়, মেঘালয়ের মাওলিনং গ্রামীণ পর্যটনের উপমাই যথেষ্ট। ডিনা-প্রভীন আমার সঙ্গেই থেকে গেল হোটেলে। আসলে একবার দেখা

পর্যটন নিয়ে সুচিন্তিত সরকারি নীতির কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু কখনও দেখেছেন, সাসটেইনেবল (টেঁকসই) পর্যটনের জন্য, পানীয় জলের সুবন্দোবস্তের জন্য, ৩০০০ কিমি গ্রামীণ রাস্তা ঠিকঠাক রাখার জন্য, চা ও কমলার উৎপাদন বাড়ানো এবং সবক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের যোগদান সুনিশ্চিত করতে— পাহাড়ে অনশনে বসেছেন গুরুং বা ঘিসিং বা হরকা বাহাদুর?'

হলে আমরা কেউ কাউকে ছাড়তে চাই না।

সকালে পিঠে রোদ্দুর নিয়ে হোটেলের সবুজ লনে জমিয়ে চা আড্ডা। এসেছেন সত্যেন লামা। বন্ধু মানুষ এবং ঘোর গুরুংপন্থী। আছে ডিনা-প্রভীন। রবিনসন ক্রুৎজার। আর তামদেন ওয়াঙ্গেল শেরপা। রবিনসন সরকারি কর্মচারী। আর তামদেন কালিম্পঙে কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে কর্মরত।

—সত্যেনদা, কমলালেবু কোথায়? আনেননি?

—১০৪ দিনের বন্‌ধে সব শেষ। এই নৈরাজ্যে আপনাদের মুখে কমলালেবুটাও তুলে দিতে পারলাম না।

—সত্যেনদা বয়স তো কম হল না। ঢপ দেওয়ার সময় দাঁতে ব্যথা করে না? বেশি পয়সার লোভে কলকাতার মাড়ওয়ারি ব্যবসায়ীদের সব লেবু বেচে দিয়েছেন। একটাও লেবু ডুয়ার্সে ঢোকেনি। আবার গোর্খাল্যান্ড এলাকার দাবিতে ডুয়ার্সকে টেনে আনেন কোন লজ্জায়?

আমার আচমকা আক্রমণে সবাই হাসিতে গড়াচ্ছে। গরগর করছেন সত্যেনদা। তামদেন বলে উঠল, 'দাদা, দার্জিলিঙের কমলালেবু এখন একটা ধারণা মাত্র। সত্তরের মাঝামাঝি সময় থেকে লেবুর ফলন খারাপ হতে শুরু করে এবং এখন গুণমান-পরিমাণ দুটোই কমে গিয়েছে। কার্শিয়াং সংলগ্ন ১১টি সাবডিভিশনে এখন চাষ হয় কিন্তু ফলন কম। স্বাদ আর আগের মতো নেই। সবচেয়ে সুস্বাদু আস্থুতিয়া কমলালেবু শেষ ভাল ফলন দিয়েছিল '৮০ সালে। আমরা আমাদের ল্যাব থেকে এখন প্রশিক্ষণ দিচ্ছি বক্সায় কমলা চাষের। বেশ সুস্বাদু কিন্তু বক্সার লেবু।'

গলা খাঁকারি দিয়ে সত্যেনদা বলার চেষ্টা করলেন, 'এখন বিভিন্ন কারণে এবং সরকারি অসহযোগিতার কারণে আগের মতো ফলন নেই কিন্তু শুরু থেকে আমরাই তো গোটা পৃথিবীকে কমলা খাইয়েছি।'

—আপনি কিস্যু জানেন না বা জেনেশুনে মিথ্যা কথা বলছেন। মধ্য সত্তরের আগে সমস্ত কমলা চাষ বাঙালি-নেপালিরা মিলেমিশে করত। লেবু বাগানে শ্রমিক সংগঠন সিপিআইয়ের। মধ্য সত্তরে সুভাষ ঘিসিং যখন মাথা চারা দেয় তখন আপনারাই বেছে বেছে কার্শিয়াং-এ বাঙালি এবং সিপিআই-এর নেতাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়েছিলেন। এমনকি যাকে ইন্দিরা গান্ধি পর্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন সেই মাননীয় সাংসদ কল্যাণ রায়ের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে তাকে দার্জিলিং ছাড়া করেছিলেন। দুঁদে কংগ্রেসি নেতা কিরণ শঙ্কর রায়ের পুত্র কল্যাণ রায়ের মতো ভদ্রলোক সাংসদ ভারতবর্ষ কম দেখেছে। কিছু মনে করবেন না। সত্যেনদা। আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসি আমি কিন্তু একটা প্রশ্ন, কী লাভ হল বলুন তো বাঙালি খেদিয়ে? সত্তরের মাঝামাঝি খেদালেন আর '৮০-র দশকে শেষ সুস্বাদু কমলা। '৯০-এ গুটিকয় চায়ের বাগান। আর ২০১৬-তে পর্যটন শেষ।

ডিনা এতক্ষণ জমিয়ে চায়ের স্বাদ নিচ্ছিল। এবার আর এক রাউন্ড চায়ের অর্ডার দিয়ে কথা শুরু করল। 'আসলে ৫০-৬০-এর দশকে তৈরি হওয়া একটা আন্দোলনের আবেগ এখনও চলছে। গোটা দেশে আন্দোলনের ভাষা-ভঙ্গিমা বদলে গিয়েছে। মানুষ মেরে, গুন্ডামি করে এখন আন্দোলন জেতা যায় না। আন্দোলনের জন্য রাজনৈতিক বিতর্ক হয়। আর তার জায়গা সংসদ। দার্জিলিং নিয়ে জঙ্গি আন্দোলন করতে গিয়ে চা-কমলার মতো ওরা পর্যটনকেও অবহেলা করেছে। ওদের পর্যটন এখন কলকাতা-শিলিগুড়ির বুকিং এজেন্টদের ওপর নির্ভরশীল। নিজের মাটিতেই আজ ওদের ভাইবোনেরা পর্যটনের উচ্ছিষ্ট খুটে খায়। পর্যটন নিয়ে সুচিন্তিত সরকারি নীতির কথা ছেড়ে দিন। কিন্তু কখনও দেখেছেন, সাসটেইনেবল (টেঁকসই) পর্যটনের জন্য, পানীয় জলের সুবন্দোবস্তের জন্য, ৩০০০ কিমি গ্রামীণ রাস্তা ঠিকঠাক রাখার জন্য, চা ও কমলার উৎপাদন বাড়ানো এবং সবক্ষেত্রে স্থানীয় মানুষের যোগদান সুনিশ্চিত করতে— পাহাড়ে অনশনে বসেছেন গুরুং বা ঘিসিং বা হরকা বাহাদুর?'

—একদম ঠিক বলেছিস ডিনা। গুরুং বা ঘিসিংয়ের বা যারা ওদের তেল জল জুগিয়েছে, একটা মারাত্মক ভুল করেছে। আবার এটাও ঠিক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ইচ্ছে থাকলেও পর্যটন নিয়ে এখনও কোনও সুচিন্তিত নীতি তৈরি হয়নি। সম্ভবত আমলা এবং হ্যাঁ হ্যাঁ বলা সঙ-দের অবহেলা ও অজ্ঞানতায়। এই ভুল আমরা আর করব না। কালিম্পং থেকে কোচবিহার গড়ে উঠুক টেঁকসই পর্যটনের নতুন সার্কিট। একদিন নয় রোজ সরকারকে পরামর্শ দিতে হবে এবং ডুয়ার্স-কালিম্পঙের স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সাসটেইনেবল পর্যটনের বিভিন্ন মডেল তৈরি করে দেখতে হবে। যেখানে ফাটকাবাজি থাকবে না এবং লিডারশিপ দিতে হবে স্থানীয় মানুষকে। কলকাতা থেকে পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, বাইরে থেকে এসে স্থানীয় মানুষকে চাকরবাকর ভিখিরি বানিয়ে ক্ষীর খেয়ে চলে যাওয়া বন্ধ করতে হবে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

জয়ন্ত গুহ

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহারে শ্রীমতি স্বনির্ভরাগণ

নারী নির্যাতন রুখতে পারেন নারীরা নিজেরাই— তাঁরা সংঘবদ্ধ হলেই আসবে তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, যা একমাত্র নিজেদের রক্ষা করবার পথ। গত সংখ্যায় 'শ্রীমতি ডুয়ার্স' কলমে প্রথম প্রতিবেদনে সরকারি সদিচ্ছায় দরিদ্র মানুষের স্বনির্ভরতার পথ কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে নারীদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ভাবনা রূপায়ণে তার একটি সরল স্বচ্ছ ধারণা আমরা পেয়েছি। নিয়মকানুনের সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা বাকি ছিল, তা দিয়েই শুরু হল এবারের 'উত্তরপক্ষ', উত্তরের নারীদের স্বনির্ভরতার সাফল্য কাহিনি।

স্বনির্ভর দলের মূল্যায়নে প্রধানত পূর্বে বর্ণিত পঞ্চসূত্র পর্যালোচনা করা হয়। দলের সদস্যদের উন্নতি বিভিন্নভাবে মাপা হয়, মিটিং প্রতিমাসে কয়টি হয়, উপস্থিতি কেমন, কী বিষয়ে আলোচনা হয়, সঞ্চয় ঠিক মতো জমা হয় কি, কতজন ঋণ পেল, পরিশোধ কেমন হচ্ছে, খাতাপত্র ঠিকঠাক রাখা হচ্ছে কি ইত্যাদি ইত্যাদি। গ্রেডিংয়ের একটা ফর্ম আছে, তাতে নম্বর দেওয়া হয় ফর্মুলা মেনে। ৭০ শতাংশের কম পেলে দলটির দুর্বলতা বুঝিয়ে বলতে হয় এবং দু' মাস পরে আবার গ্রেডিং করা হয়। অনেকে বলেন, গ্রেডিংয়ে দলটি ফেল করছে। 'ফেল' শব্দটি নেগেটিভ বার্তা বহন করে। ফেল শব্দটি তাই ব্যবহার করাই উচিত নয়।

প্রথম গ্রেডিংয়ে ৭০ শতাংশ নম্বর বা তার অধিক পেলে দলটিকে ব্যাঙ্ক ঋণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। যেহেতু ঋণ মঞ্জুরের ক্ষমতা ব্যাঙ্কের হাতে সেই কারণে গ্রেডিংয়ের সময় ব্যাঙ্ক ও সংঘকে উপস্থিত থাকতে হয়। সম্ভব হলে ব্লক বা জেলা থেকেও আধিকারিকরা উপস্থিত থাকেন।

ইনটেনসিভ ব্লকের সংঘগুলিকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা 'কম্যুনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (সি.আই.এফ) দেওয়া হয়েছে। এই টাকা সংঘ দেখেশুনে দলগুলোকে ঋণ দিতে পারে। বর্তমানে সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকা। ১০-১২ মাসে স্বল্প সুদে পরিশোধ করতে হয়— মাসিক কিস্তিতে। এই ফান্ড থেকে ঋণ দেওয়ার আগে দলের প্রতিটি সদস্য পরিবারের মাইক্রো ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (এম.আই.পি) তৈরি করা হয়।

> বর্তমানে প্রথমবার সি সি-র লিমিট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং তৃতীয়বার তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সিসি লোনের মূলধনী সাবসিডি নেই তবে দলের ঋণের তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং পরিশোধ নিয়মিত থাকলে সুদের উপর ভর্তুকির ব্যবস্থা আছে।

ব্যাঙ্কের ঋণের ক্ষেত্রে দলটি ক্যাশ ক্রেডিট (সি সি) ঋণ পায়। এই ঋণের টাকা (লিমিট) দলের মিটিং করে প্রয়োজন অনুযায়ী তুলতে পারে। হাতে টাকা এলেই তা লোনের খাতায় জমা করতে পারা যায়। লিমিট সাধারণত এক বছরের জন্য হয়। তারপরে দলটিকে গ্রেডিং করে লিমিট একই রাখা হয় (যদি দলের কাজকর্ম খারাপ হয়) একে বলা হয় রিনিউয়াল, দল ভাল করলে লিমিট বাড়ানো হয়। বর্তমানে প্রথমবার সি সি-র লিমিট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং তৃতীয়বার তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সিসি লোনের মূলধনী সাবসিডি নেই তবে দলের ঋণের তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং পরিশোধ নিয়মিত থাকলে সুদের উপর ভর্তুকির ব্যবস্থা আছে। অনেক সময় ব্যাঙ্ক সরকারি পোর্টালে ঋণের তথ্য নথিভুক্ত না করায় ব্যাঙ্কের কর্মকাণ্ড সরকারের নজরে আসে না এবং দলগুলি সুদের উপর ভর্তুকি থেকে বঞ্চিত হয়।

সি.এস.পি-দের বলা হয়েছে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে, গ্রেডিংয়ের ব্যবস্থা করে, দলকে খাতাপত্রসহ হাজির করিয়ে ব্যাঙ্ক ঋণের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ওদের

ঝ) সরকার নির্মিত বিপনন কেন্দ্র 'কর্মতীর্থ'-গুলিতে স্টল নিয়ে নানা রকম ব্যবসা করা

ঞ) সরকারের এজেন্ট হিসেবে তারা কৃষকদের কাছ থেকে নায্যমূল্যে ধান কিনছে। এমন নানা অর্থকরী কর্মকাণ্ডে মহিলারা যুক্ত আছেন। শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সাধারণ যে কাজগুলির সঙ্গে মহাসংঘ, সংঘ বা স্বনির্ভর দল যুক্ত আছেন তার একটা উদাহরণ উপরে দেওয়া হয়েছে।

আমরা এবার এমন কিছু সাহসী ও উদ্যোগী নারীর কথা বলব যারা স্বনির্ভর দলের সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পেয়েছেন।

সবিতা বিশ্বাস ও তার স্বামীর চপের দোকান

উপর চাপ ভয়ানক, কিন্তু ওরা স্বল্প সাম্মানিকে হাসিমুখে কাজ করছে। গরীব পরিবারের স্বনির্ভর দলের সামান্য শিক্ষিত মহিলারা এই দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। প্রায়ই নানা কারণে তারা বকুনি খান, যেন প্রকল্পটি শুধু সি.এস.পি-দের উপর নির্ভরশীল।

ব্যাঙ্ক ঋণ আদায় ও অন্যান্য বিষয় দেখার জন্য ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে চেয়ারম্যান করে 'কম্যুনিটি বেস্‌ড রিকভারি মেকানিজম' (সি.বি.আর.এম) কমিটি তৈরি হয়েছে। যদিও দেখা যায় বহু ব্যাঙ্ক এই কমিটিকে ব্যবহার করছে না।

ইতিমধ্যে সংঘ, মহাসংঘ এবং স্বনির্ভর দলগুলো নানা রকম আর্থিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বা পৃষ্ঠপোষকতায় যে কাজগুলো চলছে এবং সদস্যদের রোজগার বাড়ছে সেগুলি হল—

ক) মিড ডে মিলে রান্নার কাজ করা

খ) স্কুলের পোশাক তৈরি ও ছাত্রছাত্রীদের সরবরাহ করা

গ) বন্ধ চা বাগানে রেশনের দোকান চালানো

ঘ)সবলা প্রকল্পে পুষ্টিকর ছাতু তৈরি করে আই.সি.ডি.এস কেন্দ্রে সরবরাহ করা।

ঙ) সরকারি অফিসে স্টেশনারী সাপ্লাই করা

চ)সরকারি অফিসে ক্যান্টিন চালানো

ছ)গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীদের রান্না করা খাবার দেওয়া

জ) সংঘ/মহাসংঘ ভবনে স্বনির্ভর দলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

> বর্তমানে বোউলবাড়ি হাটে তাদের পকোড়া ও চপের দোকান। স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে দোকান চালায়। দল থেকে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে কিছুটা চিকিৎসায় এবং বেশি পরিমাণ টাকা তাদের ব্যবসায় লাগানো আছে। তাদের চার জনের পরিবারের অন্নবস্ত্রের অভাব নেই।

সবিতার বিপর্যয়, পাশে স্বনির্ভর দল

সবিতা বিশ্বাস প্রায় ৪২ বছর বয়স। বউলবাড়ি থেকে মাইল খানেক ভিতরে গ্রাম, নাম কুমোরপাড়া। গ্রামের বিদ্যালয়ে অল্পদিন পড়াশোনা, তবে গানের প্রতি ছিল তীব্র আকর্ষণ। ভক্তি গীতি, কীর্তন বা কখনও লোকগীতি গাইতেন। অভাবের সংসার, কিন্তু সুখ শান্তির অভাব ছিল না। শ্রীসুদেব বিশ্বাস নদীয়া জেলার মানুষ, সাড়া বাংলায় কীর্তন, বাউল সংগীত গেয়ে বেড়াতেন, বাজাতেন 'খমক'। গান গাইতে সুদেব আসেন উত্তরবঙ্গে, আলাপ হয় সবিতার সঙ্গে, তার পরিবারের সঙ্গে। স্বাভাবিক পরিণতি বিয়ে। ওই গ্রামেই ঘর বাঁধলেন। গান বাজনার আখড়া গড়ে উঠল। সুদেববাবু বিভিন্ন

ধূপগুড়ি মহাসংঘের সভা চলছে

জায়গায় গান গেয়ে বেড়াতেন। পরিবারে এল দুটি পুত্র। বর্তমানে বড় ছেলে উচ্চমাধ্যমিক ও ছোটটি মাধ্যমিকের ছাত্র। তাদের শান্তির সংসার, স্বামী ও স্ত্রীর কঠিন অসুখের কারণে গানবাজনার কাজে বাইরে যাওয়া বন্ধ হল। সবিতা ২০০২ সাল থেকে সংগ্রামী নামে একটি স্বনির্ভর দলের সদস্য। ওদের অসুখের সময় সদস্যরা নানাভাবে সাহায্য করেছে। এলাকার একজন স্বনির্ভর দলের সদস্যা এবং প্রশিক্ষণ কর্মী শ্রীমতি প্রমিলা বিশ্বাস বলছিলেন 'স্বনির্ভর দল পাশে না থাকলে সুদেব-সবিতার সংসার ভেসে যেত'।

বর্তমানে বউলবাড়ি হাটে তাদের পকোড়া ও চপের দোকান। স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে দোকান চালায়। দল থেকে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে কিছুটা চিকিৎসায় এবং বেশি পরিমাণ টাকা তাদের ব্যবসায় লাগানো আছে। তাদের চার জনের পরিবারের অন্নবস্ত্রের অভাব নেই।

সুদেববাবু ভেবে চলেছেন দু'জনের শরীর ভাল হলে আবার দেশের নান জায়গায় ঘুরে গান গাইবেন। নদীয়া জেলার গ্রাম তাকে ভীষণভাবে টানে। এখনও দলের প্রত্যেকে সর্বদা সবিতার খোঁজ খবর নেয়।

'অনুভব সংকল্প'— এক লড়াই

সমাজ ও পরিবার পরিত্যক্ত, হারিয়ে যাওয়া কিশোরীদের আশ্রয় দিয়ে তাদের সুস্থ জীবনের আলো দেখাচ্ছেন 'অনুভব হোম'-এর কর্তৃপক্ষ। কথা বলছিলাম দীপশ্রীদির সাথে। বর্তমানে অনুভব হোমে ৪৯ জন আবাসিক আছেন। বলছিলেন প্রবেশ কালে শিশুরা প্রথম দিকে কান্নাকাটি করে, পালিয়ে যাবার মানসিকতাও তীব্র। কিছুদিন বসবাস করার পর কর্মীদের আদর সোহাগ পেয়ে আর ছেড়ে যেতে চায় না। এখানে পড়াশোনার সঙ্গে হাতের কাজ শেখানো হয়ে থাকে। জলপাইগুড়ির প্রশাসন এবং নাগরিকরা এই হোম ও তার আবাসিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

হোমের ১২ জন প্রাপ্তবয়স্কা তরুণী কয়েক মাস আগে 'অনুভব সংকল্প' নামে একটা স্বনির্ভর দল তৈরি করেছে। একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে তারা দলের নামে সেভিংস-এর খাতা খুলেছে। প্রতিমাসে অল্প করে সঞ্চয় করছে, নিয়মিত মিটিং করছে। খাতাপত্র রাখছে। ইতিমধ্যে স্বনির্ভর দলের উৎপাদিত জিনিসপত্র বিক্রির জন্য প্রায় প্রতিটি ব্লকেই 'কর্মতীর্থ' নাম দিয়ে সুন্দর বাড়ি করা হয়েছে— যেখানে একাধিক স্টলে স্বনির্ভর দলের মেয়েরা নানারকম ব্যবসা করতে পারে। জলপাইগুড়ি শহরের একটা জনবহুল জায়গা পোস্ট অফিস মোড়, সেখানে যে কর্মতীর্থ আছে সেটার লবিতে ওই দলটি একটি সুন্দর ছিমছাম ক্যান্টিন চালাচ্ছে। আমি নিজে 'ভেজ মোমো' একদিন এবং অন্য একদিন হাতে গরম পরটা বেগুন ভাজা খেয়েছিলাম। সঙ্গে সুস্বাদু কফি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দামও সস্তা। খদ্দের বাড়ছে। মেয়েরা খুব সরল। আমাকে বলেছিল— 'এখন বেশি লাভের দরকার নেই, আগে দাঁড়াই'।

তবে এটুকু বুঝেছিলাম ওদের পুঁজি খুব কম। সস্তার চেয়ার টেবিল। এখন খদ্দেরদের জন্য দুটো ভাল বেসিন দরকার। কিছু বাসনপত্রের প্রয়োজনও থাকতে পারে। তবে শহরের নাগরিকরা ওদের সাহায্য করলে ওদের সেল বাড়বে এবং ধীরে ধীরে সবটাই

হোমের ১২ জন প্রাপ্তবয়স্কা তরুণী কয়েক মাস আগে 'অনুভব সংকল্প' নামে একটা স্বনির্ভর দল তৈরি করেছে। একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে তারা দলের নামে সেভিংস-এর খাতা খুলেছে। প্রতিমাসে অল্প করে সঞ্চয় করছে, নিয়মিত মিটিং করছে। খাতাপত্র রাখছে। ইতিমধ্যে স্বনির্ভর দলের উৎপাদিত জিনিসপত্র বিক্রির জন্য প্রায় প্রতিটি ব্লকেই 'কর্মতীর্থ' নাম দিয়ে সুন্দর বাড়ি করা হয়েছে

করা সম্ভব হবে। বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে তা কাজ চালানোর জন্য যথেষ্ট।

ওই কর্মতীর্থে আরও ৫-৬টি স্টল আছে। তারা স্বনির্ভর দলের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করে। হস্তশিল্প, জামাকাপড়, আচার-বড়ি, বিভিন্ন প্রকার ব্যাগ ইত্যাদি নানা জিনিস বিক্রি হয়। 'নিজলয়' হোমের কবিতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার স্টলে— একটু স্টক বাড়াতে হবে যাতে খদ্দেরের পছন্দের কিছু অপশন থাকে; আর উৎপাদিত সামগ্রীর 'লুক' অর্থাৎ দেখনদারি ভাল করাও জরুরি। স্টলের বিক্রেতারা মহিলা, তারা বললেন 'হাতের কাজের দাম কেউ দিতে চায় না। খুব সুন্দর একটা কাপড়ের ব্যাগের কাঁচা মালের খরচ ১২০ টাকা সঙ্গে মজুরি আছে। আমরা দাম রেখেছি ২৭০ টাকা, ক্রেতা ১৫০ টাকা দাম দিতে চায়। তবে এটাও ঠিক বেশ কিছু ক্রেতা হস্তশিল্পের সামগ্রী সঠিক মূল্যে কিনে নেন এবং পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন'। জেলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা ওই কর্মতীর্থে আরও কিছু পরিকাঠামো করতে সচেষ্ট আছে এবং সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। দীপশ্রীদি এবং ওনার সহযোগীদের সাহায্য এবং পরামর্শ অবশ্যই ওদের শক্তিবৃদ্ধি করেছে।

তরুণ স্বামী হারিয়ে গেল ভুটানে

জলপাইগুড়ি জেলার এক প্রত্যন্ত বন্দর আমগুড়ি। সেখানের একটি গ্রাম 'চেপটার ডাঙ্গা'। দেখা হয়েছিল সাতাশ বছরের সরস্বতী রায়ের সঙ্গে। রোগা, ফর্সা বিবাহিতা নারী— কিন্তু ভীষণ লড়াকু। কাছেই চড়চড়াবাড়িতে বাপের বাড়ি। বাবা সাধারণ কৃষক। মা-বাবা ও দুই বোনের সংসার। যখন তার উনিশ, বি.এ. প্রথম বর্ষের ছাত্রী বিয়ে হয়ে গেল সুদর্শন কর্মঠ তরুণ মনোজিত রায়ের সঙ্গে পাশের গ্রামে। সরস্বতীর সঙ্গে স্বামীর বোঝাপড়া ও সম্পর্ক মধুর। মনোজিত ভাল কাঠমিস্ত্রি ছিল। বিয়ের দু'বছরের মাথায় সন্তান। বর্তমানে সেই পুত্র সন্তান স্কুলে যাচ্ছে। ছেলের বাবা এক ঠিকাদারের অধীনে ভুটানে কাজ শুরু করেছিল। ভাল মজুরি পেত। সংসার ভালই চলত। তিন-চার মাস পর বাড়ি আসত উৎসবের আবহাওয়া সঙ্গে নিয়ে। আমোদ ফূর্তিতে সুন্দর সময় কাটত। কিছুদিন পর আবার ভুটান। ৭ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে মনোজিত সেবার বেশ ক'দিন পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে ভুটান গেল। প্রতিদিন দু'বেলা ফোনে সরস্বতীর সঙ্গে কথা বলত। ৯ এপ্রিল ২০১৪ সকালে মনোজিতের সঙ্গে কথা হল, বলেছিল বিকেলে আরও কথা হবে। সেই ফোন আর আসেনি। রাতে ঠিকাদার ফোনে জিজ্ঞেস করেছিল— 'মনোজিত কি বাড়ি এসেছে? তারপর বহুবার ঠিকাদার ভদ্রলোক ফোন করেছেন— প্রতিবার উনি হতাশ হয়েছেন। মনোজিত আর ফিরে আসেনি— হারিয়ে গিয়েছে ভুটানের চড়াই উৎরাই-এ।

লড়াই শুরু হল সরস্বতীর। থানাপুলিশ, সরকারি আধিকারিক, পঞ্চায়েত সবার দুয়ারে ঘুরেছেন। তারা চেষ্টা করেছেন, মনোজিত ফিরে আসেনি। সরস্বতী ছুটে গেছে কলকাতায় ভবানীভবনে, গোয়েন্দা পুলিশের দপ্তরে। স্বামী ফিরে আসেনি। সংসার নির্বাহের সঙ্গতি নেই। রোজগেরে মানুষটাই যে নেই। সে নিকটজনের গলগ্রহ হতে চায়নি— তাছাড়া তেমন স্বচ্ছলতাও কারও ছিল না। শ্বশুরবাড়িতে তাকে থাকা-খাওয়ার পৃথক ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এগিয়ে এসেছিল গ্রামের কিছু মহিলা। এগারো জন মিলে তৈরি করেছিল 'সূচনা স্বনির্ভর দল'। মাত্র তিন বছর আগে। দলের সদস্যারা, সংঘ নেত্রীরা তার পাশে থেকেছে। ছেলের

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

সরস্বতী রায় (মাঝখানে) দলের সঙ্গে ব্যস্ত

লড়াই শুরু হল সরস্বতীর। থানাপুলিশ, সরকারি আধিকারিক, পঞ্চায়েত সবার দুয়ারে ঘুরেছেন। তারা চেষ্টা করেছেন, মনোজিত ফিরে আসেনি। সরস্বতী ছুটে গেছে কলকাতায় ভবানীভবনে, গোয়েন্দা পুলিশের দপ্তরে। স্বামী ফিরে আসেনি। সংসার নির্বাহের সঙ্গতি নেই। রোজগেরে মানুষটাই যে নেই। সে নিকটজনের গলগ্রহ হতে চায়নি— তাছাড়া তেমন স্বচ্ছলতাও কারও ছিল না। শ্বশুরবাড়িতে তাকে থাকা-খাওয়ার পৃথক ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

পড়াশোনা, নিজেদের সুস্থভাবে চলতে মাসে পাঁচ হাজার টাকা খরচ। সংঘ তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। তার এখন সেলাই শেখার একটু অ্যাডভান্স প্রশিক্ষণ দরকার। ইতিমধ্যে দল থেকে ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন, পোশাক তৈরির কাপড় ইত্যাদি কিনেছে। সায়া, নাইটি, কুর্তি তৈরি করে। নিজেই বিক্রি করে। ফ্রক, শার্ট বা ইজের প্যান্ট তৈরি করে— তবে ডিজাইন ভাল করতে হবে। ইদানিং সে একটা গ্রামীণ বেসরকারি কিন্ডার গার্ডেন স্কুলে এক হাজার টাকা বেতনে চাকরি করছে। স্বনির্ভর দল পাশে না থাকলে শিশুপুত্রসহ মেয়েটি ভেসে যেত।

সরস্বতীর মন সর্বদাই সজাগ থাকে— এই বোধহয় মনোজিত হঠাৎ এসে সামনে দাঁড়াবে, জিজ্ঞেস করবে ‘কেমন আছ তুমি? আমাদের ছেলেটা কোথায়?’

স্বনির্ভর দলের মহিলারা নানা রকম কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন। অল্প হলেও রোজগার করছেন। কত পরিবার রক্ষা পেয়েছে— বাড়ির বউ স্বনির্ভর দল করে বলেই। আগামী সংখ্যায় সেই সব কথা থাকবে।

পালাগানের আসর

শীতের গ্রামীণ সন্ধ্যায় আজও ওম আনে

এই শীতে শুরু হয়ে গিয়েছে গ্রামে গ্রামে পালাগানের আসর। প্রতিবছর দুর্গাপুজো শেষ হতেই গানের আসর, মেলা ইত্যাদিতে গাঁ-গঞ্জগুলি জমে ওঠে। পাট, ধান খেত থেকে উঠে এসেছে। মানুষের হাতে টাকাপয়সা এ সময় থাকে বেশ, তাই মনও বেশ তরল। খোলা প্রাঙ্গনে শামিয়ানা টাঙিয়ে বা ম্যারাপ বেঁধে ভাওয়াইয়া, বাউল, পালাটিয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় সারারাত ব্যাপী। মহিলা-শিশু-পুরুষ-বৃদ্ধা-বৃদ্ধ গাঁয়ের সবাই এই আয়োজনে সামিল হয়। এর সঙ্গে তাঁরা নাড়ির টান অনুভব করেন। মনের সঙ্গে তৈরি হয় সাংস্কৃতিক সংযোগ। বিনোদন মনকে আরাম জোগায়, ক্লান্তি দূর করে শরীরের। অবসর যাপনের এ এক নিষ্কলুষ মাধ্যম। খুবই সাধারণ এই আয়োজন, কিন্তু মনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। রাজনীতি-ধর্ম-আর্থ সামাজিক অবস্থান অতিক্রম করে মানুষের মহান মিলনক্ষেত্র। দোতরার জাঙ-বাঁশির সুর, আকড়াই-এর বোল, হারমোনিয়ামের ধ্বনি, ক্ল্যারিওনেট-ঝাঁঝ একসঙ্গে বেজে উঠতেই এক মাদকতা আকৃষ্ট করে। সকলে ছোটে রাতের অন্ধকারে আলো হাতে বা চাঁদনী রাতে দলবেঁধে 'গান' শুনতে।

'মাস্টার আজি গান হোবে', সটান পরেশ ঢুকে পড়ে ক্লাসে। অনুমতির বালাই নেই। গ্রামের স্কুলের মাস্টারমশাইদের তাঁরা যে নিজের মানুষেরই মনে করে। 'অজি ছুটি দিয়া দে', যদিও তখনও বিদ্যালয় ছুটি হতে দু'ঘণ্টা বাকি। তাতে কী! 'সগায় গান শুনির যাবে, তোমরাও আসিবেন।' আমি বলি, 'আরে গান তো রাতে, এখনই ছুটি দিতে হবে কেন!' কোনও যুক্তি নেই। 'দে দে ছুটি দে।' আরও দু' একজন মানুষ এগিয়ে আসেন। এই স্কুলের ঘরেই গানের 'পার্টি' উঠবে। তাই ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁদের কাছে সব অনুষ্ঠানই গানের আসর। আর স্কুলঘর সরকারি নয়, গ্রামের সকলের সম্পত্তি। তাই পালাটিয়া শিল্পীরা স্কুলঘরে বসবেন। মেক-আপ করবেন। আরও আধঘণ্টা পর স্কুল ছুটি দিতেই হল।

দুপুর থেকেই সাজ সাজ রব। স্কুলের পাশের একটি বড় খেত। সদ্য ধান উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। সে জায়গাটি পরিষ্কার করা হচ্ছে। সমান করা হচ্ছে মাটি। ঠিক মাঝখানে বৃত্তাকারে একটি স্থান উঁচু করা হয়েছে। মাটি দিয়েই। গোবর ও মাটি দিয়ে লেপে দেওয়া হয়েছে সেই সকালেই। শুকিয়েও গিয়েছে। বাঁশের ম্যারাপ বেঁধে কাপড় লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গাঁয়ের যুবা-তরুণরাই করছে সব কিছু। স্কুলের রান্নাঘরেই রান্না হবে শিল্পীদের খাবার। সকলে হাতে হাতে কাজ করছে। হইচই চিৎকার ছোটাছুটিতে জায়গাটি সরগরম। দু' একটি করে দোকান বসবারও আয়োজন চলছে। ছোটদের মধ্যেও চাঞ্চল্য-উৎসাহ-আনন্দ। তখনকার মতো বাড়ি ফেরা গেল। কারণ পালাগান শুরু হবে রাত দশটায়। সব দেখেশুনে আমার মনেও গভীর আকর্ষণ জন্মেছে এখানে আসবার।

> পায়ে পায়ে পৌঁছে গেলাম এক অন্য পৃথিবীতে। আলো-আঁধারী বৃত্তগুলি আসলে এক একটি জুয়ার আড্ডা। ঘুটঘুটি খেলা চলছে। কোথাও বসেছে নম্বর লেখা চক্রের খেলা। তিনটি তাসের জুয়া চলছে রমরম করে। গ্রামের লোকেরা খেলছে চকচকে লোভী চোখ নিয়ে। আছে মদ্যপানের আসরও। দেশি বাংলা তরল গিলছে কিছু মানুষ। বিক্রি হচ্ছে মুরগি-খাসির ছাটের চাট। নরক গুলজার।

সাজঘর

জমজমে রাত— কনকনে শীত। টুপি মাফলার বাগিয়ে মোটরবাইকে একজনকে সাথী করে চললাম পালাগান শুনতে। দৃশ্যশ্রাব্য একটি বিষয়, তবুও লোকনাট্য শুনতে যাওয়ার কথাই সকলে বলে। শহরের নিয়ন আলোর রাস্তা পেরিয়ে গাঁয়ের অন্ধকার পথ ধরলাম। এখন তো তবুও কিছু কিছু সোলার ল্যাম্প বসেছে সাংসদ তহবিল অথবা বিধায়ক তহবিলের আনুকূল্যে। একসময় তো সূর্য ডুবে গেলে হ্যারিকেন অথবা টর্চের আলোতেই গ্রামের ভরসা গাঢ় অন্ধকারে। বেশ কিছু বছর হল গ্রামে এসেছে বিদ্যুৎ। বাড়ি বাড়ি দেওয়া হয়েছে সংযোগ। আমরা চলেছি গভীর অন্ধকারের বুক চিরে।

দূর থেকে আলোকিত একটি অংশ দেখতে পাচ্ছি। সেটাই আসর। দূর থেকে আলো অন্ধকারে রহস্যময় মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে পৌঁছানো গেল সেই আসরে। পালা শুরু হতে বাকি আছে আরও কিছুটা সময়। লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। মহিলা ও পুরুষদের বসবার পৃথক ব্যবস্থা। খড়ের ওপর ত্রিপল পেতে দর্শকাসনের আয়োজন। বিদ্যুতের আলো লাগানো হয়েছে। আছে জেনারেটর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট ছোট বিকিকিনির আয়োজন গুয়া-পান, পাপড়ভাজা, তেলেভাজার দোকান। আছে মণিহারি দোকান। মটরের ঘুগনি, চায়ের দোকানও আছে। শিশুদের ছোটাছুটি, বড়দের হাঁকডাক, মহিলাদের যাতায়াত মাথার তেলের উগ্রগন্ধ সব মিলিয়ে বাতাস ভারী হয়ে আছে। মন বলল চল সাজঘরে। শিল্পীদের রূপসজ্জা চলছে। সস্তার রং, পাউডার, আলতা, সিঁদুর, কুমকুম, কাজল দিয়ে। কম দামী কাপড়, পরচুলা দিয়ে এক একজন চরিত্র হয়ে উঠছেন। ছেলেরাই হয়ে উঠছেন মহিলা চরিত্র। মহিলারাও আছেন। তাঁরাও অভিনয় করবেন।

একপাশে পুজোর আয়োজন। একটি স্টিলের বড় প্লেটে ধূপদানী, কিছু ফুল একটি ছোট গ্লাসে জল। কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র এবং নাট্যে ব্যবহার্য জিনিসপত্র রাখা। দলের বরিষ্ঠ সদস্য চোখ বন্ধ করে পুজোর মন্ত্র আউড়ে চলেছেন। সে আর কিছুই নয়, মাতৃভাষায় প্রার্থনা সমস্ত দেবতাদের নিকট যেন আজকের নাট্যানুষ্ঠান ভাল হয়। নির্বিঘ্নে হয় যেন সবকিছু। পুজোর শেষে গ্লাসের জলটি ফুল দিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হল সবার ওপর এবং মঞ্চস্থলেও। সাজঘর থেকে বেরিয়ে এলাম একটু তফাতে। দূরে দৃষ্টি গেল। একটি প্রাঙ্গন, বেশ রহস্যময়। ছোট ছোট জটলা এক একটি আলোর চারপাশে। সে সব আলো সব

হ্যাজাকের। এক একটি হ্যাজককে ঘিরে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে বা বসে। এমন অনেকগুলি আলো-আঁধারী বৃত্ত। রহস্যবৃত্ত সে অঞ্চলের দিকে আমিও এগিয়ে চললাম।

পায়ে পায়ে পৌঁছে গেলাম এক অন্য পৃথিবীতে। আলো-আঁধারী বৃত্তগুলি আসলে এক একটি জুয়ার আড্ডা। ঘুটঘুটি খেলা চলছে। কোথাও বসেছে নম্বর লেখা চক্রের খেলা। তিনটি তাসের জুয়া চলছে রমরম করে। গ্রামের লোকেরা খেলছে চকচকে লোভী চোখ নিয়ে। আছে মদ্যপানের আসরও। দেশি বাংলা তরল গিলছে কিছু মানুষ। বিক্রি হচ্ছে মুরগি-খাসির ছাটের চাট। নরক গুলজার। এই জুয়া-মদের আড্ডা বসে কোনও একজনের তত্ত্বাবধানে। পালাগানের আসর বসানোর জন্য যে আর্থিক খরচ হয় তা জোগায় জুয়ারর আড্ডার মালিক।

ওদিকে শুরু হল পালার সম্মেলক বাদ্য। চললাম মঞ্চের দিকে। সেখানে শুরু হবে পালা 'প্যাঁচকাটার সংসার'। বাজনা শুনে সবাই এসে বসল দর্শকাসনে। গুয়া-পানের গন্ধে বিড়ির ধোঁয়ায় এখানে এক অন্য আবহাওয়া। শুরু হল পালা ছুকরি নাচের মধ্য দিয়ে। এই নাচে ছেলেরা মেয়ে সেজে নৃত্য পরিবেশন করেন। ছুকরি নাচেরর পর বন্দনা গান। সমস্ত দেবতাকে বন্দনা করে এই গান করেন মূল গীদাল। তারপর শুরু হল মূল গল্পের অভিনয়। একটি মধ্যবয়স্ক চরিত্র প্যাঁচকাটা। রোগে ভোগা শরীর তার। তায় দুটি বউ। গরীবের সংসারে ছোট বউ বড় বউকে নিয়ে কত যে সমস্যা। সে সব কিছু নিয়েই পালা 'প্যাঁচকাটার সংসার'। শুরু থেকেই টানটান আকর্ষণীয় ঘটনার ঘনঘটা। কত যে তার চরিত্র গ্রামের যুবা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ধনী মানুষ ও তাঁর মুসলিম সহকারী, পঞ্চায়েত প্রধান, গোঁসাই ও তাঁর সাধন সঙ্গীনি। সব মিলে চলছে ঘটনা পরম্পরা। মূল চরিত্র প্যাঁচকাটার দেখা নেই। অথচ সব আলোচনা চলছে তাকে ঘিরেই। দর্শকের মনে এক ছবি তৈরি হচ্ছে, তাকে দেখার আকর্ষণও। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেল। মঞ্চে কোনও চরিত্র নেই। শুধুই বাজনা বাজিয়ে চলেছেন বাদ্যযন্ত্রীরা। হঠাৎ দূরে মঞ্চের প্রবেশপথে দেখি একজন মানুষ, তার হাত-পা-গুলি শীর্ণ, পেট প্রয়োজনের তুলনায় বেশ বড়। মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাঁটছে আর দাঁড়াচ্ছে আবার এগিয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে চোখ বুলিএয় নিচ্ছে চারপাশ। তবে তার প্রতি নজর পড়তেই আর চোখ সরানো যাচ্ছে না। আকর্ষণ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা তার। একজন দেখলেই চোখ না সরিয়ে পাশের জনকে হাতের ছোঁয়ায় দেখাচ্ছে তাকে। সে-ও যেন চোখে আটকে যাচ্ছে তার প্রতি। সে আবার

পালার মহড়া চলছে

পাশের জনকে ছুঁয়ে নিজের অনুভূতি প্রবাহিত করছে। এগিয়ে আসছে চরিত্রটি। ক্রমশ চুপ-নিশ্চুপ হয়ে যাচ্ছে সকলে। আবহর শব্দমাত্রাও ধীরে ধীরে কমে আসছে। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে অদ্ভুত স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে সেই চরিত্র মঞ্চে উপস্থিত হয়। চারপাশে প্রায় দু'হাজার দর্শক। তাদের অপলক চাহনি সেই চরিত্রের ওপর নিবদ্ধ। চরিত্রটি মঞ্চে এসে চোখ বুলিয়ে নেয় সমস্ত দর্শকাসনে। জরিপ করছে যেন সে। বুঝে নিতে চায় সকলকে। নিঃশব্দের এই পরিবেশে বলে সে তার প্রথম সংলাপ 'মোরে নাম প্যাঁচকাটা'। হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা এই কথাগুলি। দর্শকগণ নড়েচড়ে বসেন। নতুন কিছু হওয়ার আকাঙ্খায়। পুনরায় আবহ শুরু হয়। পরিবেশ বদলে যায়। প্যাঁচকাটা প্রবেশের পূর্বে ও পরে নাট্য উপস্থাপনের ভিন্ন দুই রূপ যেন। অনন্য অভিনয় দক্ষতা, সংলাপ বলবার সৃজনীক্ষমতা। কারণ লোকনাট্যে সব চরিত্র তাদের সংলাপ বলে তাৎক্ষণিক নির্মান করে। রাত কেটে ভোর হয়ে গেল কীভাবে জানি না। কী অসাধারণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম সে রাতে ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। গ্রামের লোকনাট্যের আসরে রাত কাটানোর জীবনে নির্মল আনন্দের সঞ্চয় হয়।

যে সৃজনীশক্তি দেখেছি পালাগান বা লোকনাট্যের আসরে তা সত্যিই জীবনে অন্য অনুভূতি। পালার নাম নির্বাচনে বা সংলাপ রচনার দক্ষতায় দর্শক আকৃষ্ট হয়। সমাজের অন্যায়-অবিচার-ভাল-খারাপা সব প্রকাশ পায় পরিবেশনে। জলপাইগুড়ি জেলার মানিকগঞ্জ অঞ্চলে অসাধারণ পালা তৈরি হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। পুরাণ শাস্ত্র নির্ভর 'পটপটিয়া গোঁসাই, জ্ঞানবালা দাসী', ব্যঙ্গাত্মক পালা 'উপর চোখা প্রধান, বাঙ্গিফোটা পঞ্চায়েত', সমাজের সুখ দুঃখের কাহিনি 'বৌমা মিস্‌ড কলটা কার', 'প্যাঁচকাটার সংসার', 'অন্ধ বাপের দারোগা বেটা', বাপের জেল সাক্ষী বেটা', 'ডাইনি মায়ের মাতাল ছেলে', 'বৌমার কারণে শাশুড়ি জেলে', সামাজিক কেচ্ছা সত্য ঘটনা অবলম্বনে পালা 'ময়নার চক্ষুর জল',

বাঁ দিকে ওপরে পুরুষারাই মেয়ে সেজে অভিনয় করেন, নিচে পালা চলছে, ওপরে বিষহরি পালার সামগ্রী

'অহংকারী শাশুড়ির লক্ষ্মী বৌমা', 'শ্বশুর ভগবান, বৌমা রাখিবার পারিলেক নাই শাখা সিঁদুরের মান' ইত্যাদি অত্যন্ত জনপ্রিয়। রাজবংশী কথ্যভাষায় এই পালাগুলির আসরে দেড়-দু'হাজার দর্শকের আগমন খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

আর কী অসাধারণ সংলাপ। প্যাঁচকাটা বলে, 'মোর দুইটা বউ, ছোটকি-বড়কি। দুইটাকে ধরিয়া মোর খুব ঝামেলা। মুই তো টাওয়ার-এ পাও না। নিজের অসুস্থতা বোঝাতে সংলাপ, 'দেহটা মোর কাগজের নাখা পাতেলা হয়্যা গেইসে'। অসাধারণ একটি খুব মজার সংলাপ, 'দাদা হামা গোটা সাইকেলটা একসাথ কিনিম না। একদিন প্যাডেল, একদিন হ্যান্ডল, একদিন চাক্কা কিনিম। তাইলে লোকজন বুঝির পারিবে দেউনিয়াঘর সাইকেল কিনেছে...'। ওষুধ খেতে না চাওয়ায় জোর করে বেশ বড়

একটি ট্যাবলেট খাওয়াতে গেলে, 'আরে! তোমরা তো মোক বিনা টিকিটে ফারাক্কা নিগাবেন!' সংলাপ, অভিনয় সঙ্গে গান। পালাগুলির অমোঘ আকর্ষণ প্রবল শীতকে উপেক্ষা করে দর্শকদের বসিয়ে রাখে সারারাত। আর পালাগুলির অভিনয় হয় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে রাতের পর রাত।

পালাগুলিকে ঘিরে আবেগ, মনের গভীর টান অনুভব করেন কৃষিজীবি মাটির মানুষগুলো। এখন গ্রামের প্রায় সব বাড়িতেই টেলিভিশন এসে গিয়েছে, লাগানো হয়েছে কেবল কানেকশন। সব ধরনের অনুষ্ঠানের স্বাদ পেয়ে গিয়েছেন গাঁয়ের মানুষরা যা পেয়ে থাকেন শহরের মানুষ। এসে গিয়েছে ফোর-জি মোবাইলও। তবুও তো এখনও যে পালা অনুষ্ঠানগুলি হয় তাতে এক-দেড় হাজার দর্শকের উপস্থিতি খুব সাধারণ ঘটনা। আসলে প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লোকনাটকের কাহিনি, উপস্থাপন পদ্ধতি। সেই কবে প্রাচীনকাল থেকে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশের মতো শুভ অনুষ্ঠানে বিষহরি পালার আয়োজন করা হয় গৃহস্থের মানসিক অনুযায়ী। আচারভিত্তিক যা কিছু অনুষ্ঠান তাতে সংগীতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলে মনের গভীর টান অনুভব করেন অবসর বিনোদনের এই মাধ্যমে। মনের আনন্দেই এর প্রকাশ।

কবে যে শুরু হয়েছিল এই পালাটিয়ার আসর বলা মুশকিল। মানিকগঞ্জ অত্যন্ত প্রাচীন জনপদ। জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের অন্তর্গত হলদিবাড়ি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে পশ্চিমে মানিকগঞ্জের অবস্থান। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। এখানে পালাটিয়ার প্রতিযোগিতা হত একসময়, বলেন এখানকার সত্তর-আশি উর্দ্ধ বৃদ্ধগণ। শোনা যায় দোল পূর্ণিমার রাতে শুরু হয়ে পাঁচ ছয় রাত চলত এই প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণ করতেন বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীগণ। এ সমস্ত খরচ জোগাতেন সম্ভ্রান্ত আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ মানুষেরা। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী নির্বাচন করতেন বয়স্ক বুদ্ধিমান মানুষেরা, যাঁরা সর্বজনমান্য ছিলেন। মজার কথা হল এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার দেওয়া হত দশ কেজি, সাত কেজি, পাঁচ কেজি পাঁঠা বা খাসি। এই প্রতিযোগিতা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। ধীরে ধীরে অনেক দল গঠন হয়। শুধু মানিকগঞ্জে নয়, আরও অনেক জনপদে। প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু জনপ্রিয়তার তীব্রতায় পালাটিয়া আসর বসে গ্রামে গ্রামে। এখনও মানিকগঞ্জে যে দলগুলি অভিনয় করে তারা অত্যন্ত ঋদ্ধ, দক্ষ। বর্ষায় প্রবল খাটুনির পর এই পালার আসরগুলি জীবনে আনে আরামের অনুভূতি। দূর হয়ে যায় ক্লান্তি। খেতে মাঠে কাজ করা পরিশ্রান্ত মানুষগুলির জীবনে এ যেন সেই পরশ পাথর যা আনে সোনার আভায় নতুন ভোর।

> 'মোরে নাম প্যাঁচকাটা'। হৃদয়ের গভীর থেকে উঠে আসা এই কথাগুলি। দর্শকগণ নড়েচড়ে বসেন। নতুন কিছু হওয়ার আকাঙ্খায়। পুনরায় আবহ শুরু হয়। পরিবেশ বদলে যায়। প্যাঁচকাটা প্রবেশের পূর্বে ও পরে নাট্য উপস্থাপনের ভিন্ন দুই রূপ যেন। অনন্য অভিনয় দক্ষতা, সংলাপ বলবার সৃজনীক্ষমতা। কারণ লোকনাট্যে সব চরিত্র তাদের সংলাপ বলে তাৎক্ষণিক নির্মান করে। রাত কেটে ভোর হয়ে গেল কীভাবে জানি না। কী অসাধারণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম সে রাতে ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়।

সব্যসাচী দত্ত

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি প্রকাশিত হতেই সাড়া

গত তেইশে ডিসেম্বরের বিকেল। পার্ক স্ট্রিটের ভিড় ছড়িয়ে গিয়েছে গোটা মধ্য কলকাতা জুড়ে। ট্রাফিক চলছে থমকে থমকে। ময়দানে প্রেস ক্লাবের মূল সভাঘর তখন গম গম করছে অতিথি ও সাংবাদিকের সমাগমে। মঞ্চে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে

প্রকাশিত হল দেবপ্রসাদ রায়ের বই 'ডুয়ার্স থেকে দিল্লি'। প্রথম কপিটি মোড়ক খুলে ক্যামেরার সামনে তুলে ধরলেন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, হাততালিতে ভরিয়ে তুললেন ঘর জনপ্রিয় নেতা 'মিঠুদা'-র শুভানুধ্যায়ীরা। শীর্ষেন্দুবাবু বললেন লেখকের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা, পুরনো পরিচয়ের কথা, আর আশ্বাস দিলেন সততার সঙ্গে কোনও আপস হবে না এ বই লেখায়, এ বই সুখপাঠ্য হবেই। বাকিরা তাঁদের টুকরো স্মৃতিচারণের সঙ্গে লেখক হিসেবে দেবপ্রসাদ রায়ের নতুন জীবনের শুভকামনা জানালেন। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সবার প্রিয় মিঠুদা রওনা দিলেন উত্তরবঙ্গের ট্রেন ধরতে, সে সময় আলিপুরদুয়ার বইমেলায় 'এখন ডুয়ার্স' স্টলে সদ্য পৌঁছনো 'ডুয়ার্স থেকে দিল্লি' বইটি কিনতে রীতিমত ভিড় জমেছে। চারদিন পরে ২৭ ডিসেম্বর বিকেলে মালবাজারে জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলার

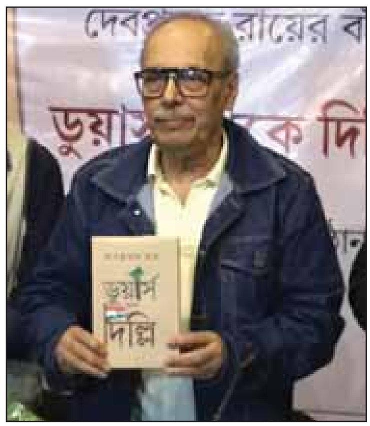

উদ্বোধন মঞ্চে হাজির ছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঙ্গে দেবপ্রসাদ রায়। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক ও এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন, ইতিমধ্যে আমি নিজে বইটি কিনে পড়ে ফেলেছি, আপনারাও যেখান থেকে পারবেন কিনে পড়ুন। ২৮ ডিসেম্বর বিকেলে জলপাইগুড়ির আড্ডাঘর-এ আয়োজিত চা-চক্রে আমন্ত্রিত বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের চেয়ারম্যান মিহির গোস্বামী উত্তরবঙ্গের জন্য বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন, উপস্থিত ছিলেন চা শিল্পপতি কিষণ

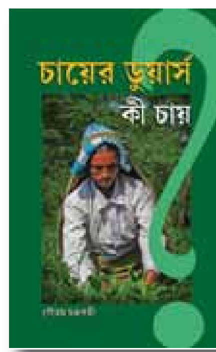

কল্যাণী, ক্ষুদ্র চা চাষি সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয় গোপাল চক্রবর্তী, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং সর্বোপরি লেখক দেবপ্রসাদ রায়। এদিন কিষণ কল্যাণীর হাত দিয়ে প্রকাশিত আরেকটি বই গৌতম চক্রবর্তীর লেখা 'চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?'। শীতের সন্ধ্যায় জমে উঠেছিল আড্ডাঘর, বলাই বাহুল্য। **নিজস্ব প্রতিবেদন**

মেথি চিংড়ি

ডুয়ার্সের ডিশ

উপকরণ: একটু বড় চিংড়ি ২৫০ গ্রাম। পেঁয়াজ বাটা বড় ১টা, টম্যাটো বাটা বড় ১টা, কাঁচা লঙ্কা বাটা স্বাদ অনুসারে, হলুদ হাফ চা চামচ, ফেটানো টক দই হাফ কাপ, মেথি দানা হাফ চা চামচ, কসুরী মেথি ২ চা চামচ, লবণ স্বাদ অনুসারে, সাদা তেল ৩/৪ চা চামচ।

প্রণালী: মাছগুলি ভাল করে ধুয়ে লবণ হলুদ মাখিয়ে আধ ঘণ্টা রেখে দিন, প্রথমে কড়াইতে সাদা তেল দিন ও মেথি দানা দিয়ে দিন, দানাগুলো বাদামি রং হয়ে গেলে তেল থেকে তুলে ফেলে দিন এরপর প্রথমে পেঁয়াজ বাটা দিন তারপর টম্যাটো বাটা দিন, ভাল করে কষাতে থাকুন। এরপর হলুদ লবণ ও কাঁচা লঙ্কা বাটা দিন ও কষাতে থাকুন। ফেটানো দই দিয়ে দিন, মশলা থেকে তেল বের হলে কাঁচা মাছগুলি ছেড়ে দিন ও ভালভাবে নেড়ে কম আঁচে ঢেকে রান্না করুন যাতে মাছগুলি সেদ্ধ হয়ে যায়। তারপর কসুরি মেথি দিয়ে ভাল করে নেড়েচেড়ে ঢেকে রাখুন ও গ্যাস বন্ধ করে দিন। সাদা ভাত, ফ্রাইড রাইস বা পোলাও— সবার সঙ্গে দারুণ জমে যাবে।

শ্রাবণী চক্রবর্তী

কলকাতায় গ্রাহক নেওয়া হবে।

কলকাতায় 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার ২০১৮ সালের গ্রাহক নেওয়া হবে। এবার ঘরে বসেই নিয়মিত পেতে পারেন আপনার কাঙ্খিত পত্রিকাটি।

চাইলেই কলকাতার বাড়ি বা অফিস/দোকানের পুরো ঠিকানাসহ মেল করুন। কমপক্ষে ১০০ জন না হলে এই পরিষেবা চালু করা যাবে না। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে যে মেল আসবে তার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

editor.ekhonduars@yahoo.com

নতুন বছরের ক্যালেন্ডার

এবারও 'এখন ডুয়ার্স'-এর ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হয়েছে। ছবিগুলি আলিপুরদুয়ারের শৌভনিক চক্রবর্তীর তোলা। ডুয়ার্সের আদিবাসি তরুণীদের অকৃত্রিম সৌন্দর্য ধরা পড়েছে শৌভনিকের ক্যামেরায়, সেদিক থেকে এবারের ক্যালেন্ডার অন্যান্যবারের তুলনায় আলাদা। 'এখন ডুয়ার্স'-এর পত্রিকা ও বইয়ের পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া হল ইংরাজি নববর্ষের এই উপহার।

Hotel Yubraj & Restaurant Monarch

(Air Conditioned)

Room	Single	Double
Super Deluxe (Non AC)	Rs 650	900
Deluxe AC	Rs 990	1200
Super Deluxe AC	Rs 1100	1300
VIP Deluxe AC	Rs 2000	2000
Suite	Rs 3000	3000
VIP Suite	Rs 3500	3500
Extra Occupancy on (Non AC)	Rs 100	---
Extra Occupancy on (AC)	Rs 200	---

N.B. Tax as per applicable

Charu Arcade, B. S. Road, Cooch Behar, (W.B.)
Tel: (03582) 227885 / 231710
email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubraj.com

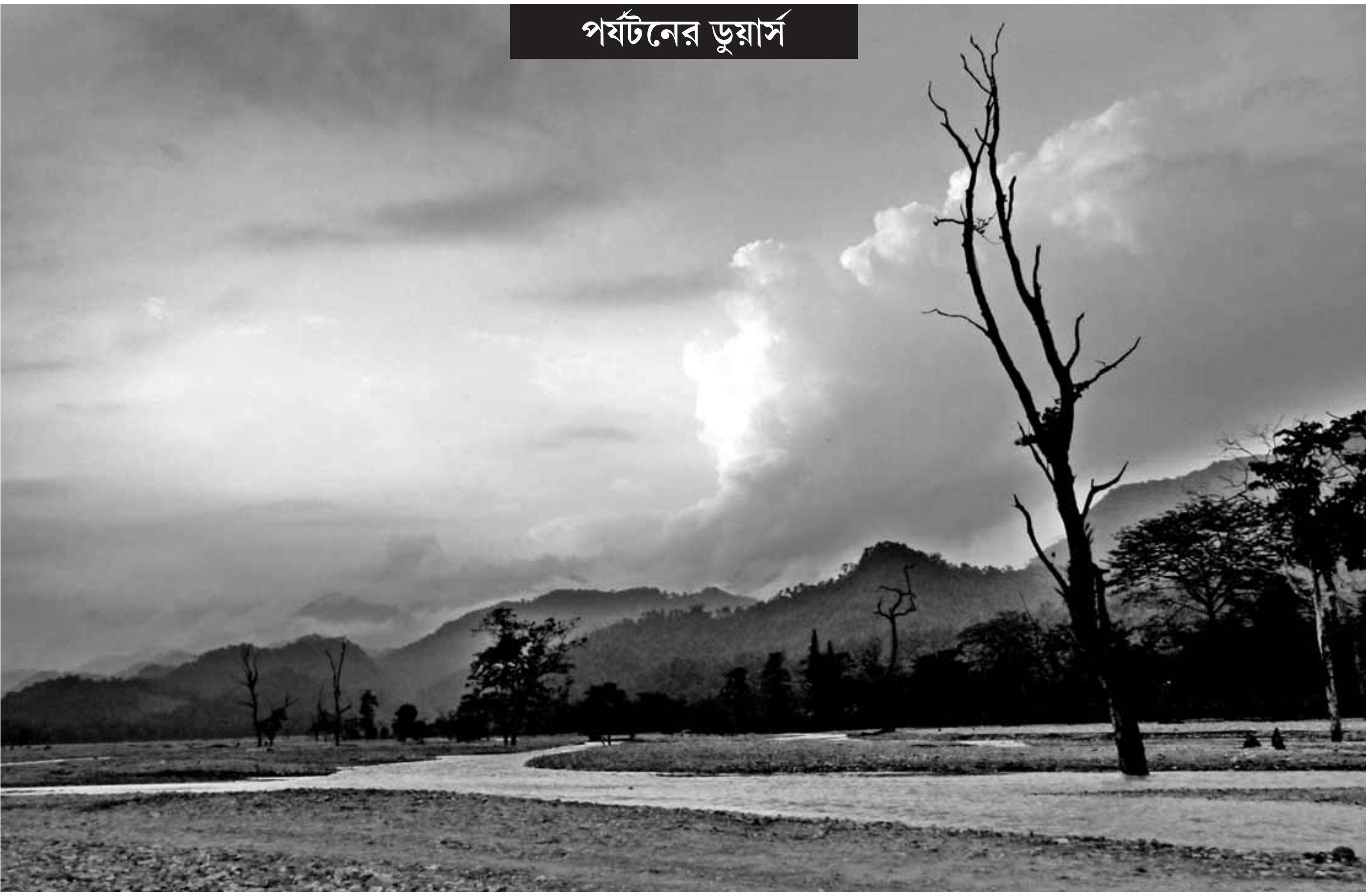

ছবি ডা. প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

জয় জয়ন্তী

জয়ন্তী নিয়ে আমার বেশ ন্যাক আছে। বারবার যাই, একদিনের নামে গিয়ে মিনিমাম ৩ দিন। ছোটবেলায় গিয়েছি আবছা স্মৃতি, বড় হয়ে উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে একা একা হপ্তাখানেক। ভয়ংকর ঝড়ে আটকে দোতলার কাঠের ঘরে লন্ঠনের আলোয়। ৭ দিন বিদ্যুৎ নেই, বালা নদীতে জল, তাই বাস আসছে না ৩-৪ দিন। অসভ্য জগতের সাথে যোগাযোগ নেই। আমি জয়ন্তী নদী জঙ্গল পার করে একা একা চলে যেতাম ভুটিয়া বস্তি। আড্ডা মারতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এক খুকরি বা কুকরি পেয়েছিলাম উপহার, এখনও বিছানার তলে পুষে রাখা।

তারপর আমি কলকাতাবাসী। খবর পেতাম, রাখতাম জয়ন্তী নামক আজব গ্রামের। পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্গত বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পর একেবারে মধ্যিখানে এই গ্রাম। চারদিকে খালি বুনো গন্ধ পাওয়া যায়। মশা বিশেষ নেই তবে সাপখোপ আছে বিস্তর। গ্রামবাসীরা বলে, ও সব আমাদের ছেলেপুলের মতো!

> সেই আদিম যুগে জয়ন্তীর মতো জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা শূন্য। শুধু যোগাযোগ নয়, বিনোদনও ছিল শূন্য। সন্ধে হলেই হাতির ডাক, বাঘের ডাক, রাক্ষুসে ঝিঁঝি আর জনাকয়েক বিহারী পরিবারের খোলকত্তাল নিয়ে রামা হো রামা হো গান... এই ছিল এন্টারটেইনমেন্ট।

পর্ব-১

এক বর্ষায় বালা নদীতে জল উত্তাল। সরকারি একটিই বাস আসে জয়ন্তীতে, সকাল ন'টা নাগাদ... এখন সেটিও গেল উল্টে। তখন মোবাইল ফোন, মেট্রোতে বা এয়ারপোর্টে দেখা যেত মোটা চেন বন্দি, পকেট থেকে ঝুলছে। সেই আদিম যুগে জয়ন্তীর মতো জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা শূন্য। শুধু যোগাযোগ নয়, বিনোদনও ছিল শূন্য। সন্ধে হলেই হাতির ডাক, বাঘের ডাক, রাক্ষুসে ঝিঁঝি আর জনাকয়েক বিহারী পরিবারের খোলকত্তাল নিয়ে রামা হো রামা হো গান... এই ছিল এন্টারটেইনমেন্ট।

তো সেই অকালের যুগে, টানা কয়েকদিনের ঘোর বর্ষায় জয়ন্তীর একমাত্র রাস্তা বালা নদী হল বানভাসি। শুধু তাই নয়, সেই একমাত্র বাসটি গেল নদীতে উল্টে! তোলার লোক নেই, কিন্তু খবর দেবার লোক

ছবি ডা. প্রদীপ্ত চক্রবর্তী

আছে। বিদ্যুৎ বেগে খবর গেল পৌঁছে জয়ন্তী বাসস্ট্যান্ডে।

মনস্তাত্ত্বিকগণ বলেন, বিকৃতি বা বীভৎসতা মানুষের আদিম রক্তে বইছে। এতে দোষ নেই। উপকার আছে, আবার আনন্দও আছে।

জয়ন্তীর মানুষ একটি ট্রাক ভাড়া করল। এক ট্রাক মানুষ চলল বানভাসি বাস দেখতে। এবার সেই বিরাট দলে ছিল ছোট্ট একটি পাখির মতো বালক শিবাজি। আজ সে যদিও এক বেসরকারি ব্যাঙ্কে কর্মরত গোঁফ দাড়িওয়ালা লোক! যাই হোক...

বালা নদীর দু'ধারে গভীর জঙ্গল। বক্সার ভয়াল অরণ্য। ট্রাকটি অকুস্থলে পৌঁছে, ঘুরে ফিরে, সাইড সিন ও প্রয়োজনমতো সাহায্য করে দলটি ফিরে গেল। মাঝ রাস্তায় এক আর্ত চিৎকারে কেঁপে উঠল জঙ্গল, থেমে গেল ট্রাক। শিবাজির মা ও পিসির আর্তনাদ, শিবাজি মিসিং!

এদিকে সন্ধে ঘনায়। ট্রাক দাঁড়িয়ে আবার। জঙ্গলে ছড়িয়ে গেল জয়ন্তীবাসী। কিছুক্ষণ পর জঙ্গলে শোনা যায় গুলির শব্দ! আর আর্তনাদ। 'পেয়ারা... পেয়ারা...'

জঙ্গল প্রহরী বন্দুক নামিয়ে নেয়। জঙ্গলে যারা খুঁজছিল শিবাজি, তারা গেল থমকে। শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। হঠাৎ খচমচ শব্দে জঙ্গল প্রহরীর দল ধরে আনে শিবাজী। মাথা নিচু, মুখে বিড়বিড়... 'পেয়ারা, পেয়ারা'। উৎসুক মা পিসি সহ জনতা। উন্মোচিত হল শিবাজী রহস্য। আসলে, জয়ন্তী ট্রাকে আসার সময়ই গভীর জঙ্গলে শিবাজীর চোখে পড়ে এক পেয়ারা গাছ। তাক করে থাকে। বালা নদীর ডোবা বাসের অছিলায় চম্পট দেয় পেয়ারা সন্ধানী শিবাজী।

এদিকে গভীর বর্ষার জঙ্গলে অজানা শব্দে ভীত জঙ্গল প্রহরী ভাবে, এল বুঝি চোরা শিকারী! এই সময় গভীরতম অরণ্যে একমাত্র চোরা শিকারী আর বন্য জন্তু ছাড়া আর থাকে না কেউ। ব্যস... চলল ফায়ার 'দুম দুম'।

চ্যাঁচায় শিবাজি 'আরে আমি পেয়ারা... পে পে পেয়ারা'

গার্ড 'তোবা তোবা, রাম রাম' করতে করতে দৌড়।

কান ধরে হিড়হিড় করতে করেত নিয়ে এল। মা, পিসির হাউমাউ কান্না...। ছাড়া পেয়ে লাল হয়ে গেল লজ্জায় (তখন হওয়া যেত, কোনও দোষের ছিল না)।

জয়ন্তীতে এরকম হাজারো ঘটনার ঘনঘটা।

পর্ব-২

একবার জলপাইগুড়ির এক পাড়াতুতো দাদার বিয়েতে গিয়েছি জয়ন্তী। কয়েকশো লোক নিমন্ত্রিত। জঙ্গলমহল উত্তপ্ত।

বিয়ে মিটে গেল ভালভাবেই। মানে কোনও বিরাট গোলযোগ ছাড়াই। শুধু দু' একটা বাচ্চা জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিল। তারা ফিরল বেশ কয়েক ঘণ্টা পর বিধ্বস্ত অবস্থায়! বাজুদা, আমার এক জামাইবাবু, বিয়ের দিন, একবেলা, মানে সকাল থেকে সন্ধে অবধি বেপাত্তা ছিল... সন্ধেবেলা তাকে এক অচেনা টুরিস্ট জিপ থেকে উদ্ধার করা হয়। সেই জিপের লোকজনকে আমরা চিনি না, বাজুদার বক্তব্য, সেও চেনে না এমনকি সেই টুরিস্টরাও চেনে না বাজুদাকে! কেউ কাউকে চেনে না, অথচ!

আমি মাঝরাতে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিলাম, শেষে এক নিষিদ্ধ আড্ডা থেকে ভোররাতে আমাকে বুলকিদি উদ্ধার করে আনে।

আর বৌভাতের দিন রাতে হাতি এসে বাড়ির পেছনের প্যান্ডেল ভেঙে দিয়ে চলে যায়! বউ বসে ছিল সিংহাসনে একা, আর সব্বাই ভয়ে যে যেদিকে পারে দৌড়ে

পালিয়ে গিয়েছিল ! ব্যস্ এটুকুই ! পরদিনও নিমন্ত্রিতদের অনেকেই ছিলেন। ছুটি কাটানোর আমেজ আর কি ! আমিও তখন চাকরি করি। অফিসে ফোন করে,দাদুর বাতের ব্যাথা, না ঢাকুরিয়ায় বন্যা গোছের কিছু একটা বলে চুপচাপ বসে ছিলাম, কারণ ফোন তো আর আসবে না ! তখনও জয়ন্তীতে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক পাওয়া যেত না। পিসিও বুধ ছিল একটাই। সেটাও আবার ওষুধের দোকান ও পোলট্রি ফার্মের সাথে। বেশি জোরে কথা বলা যেত না। চ্যাঁচালেই মুরগিগুলো তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠত।

যা হোক...বৌভাতের পরদিন রাতে সক্কলে খাওয়াদাওয়া করে যে যার মতো শুতে যাবে। বর্ষার রাত, তার ওপর জমজমাট জঙ্গল ! টিপটিপ বৃষ্টি, রাতও প্রায় সাড়ে বারোটা। হঠাৎ বাড়ির পাশে একটা ঝোপের মধ্যে সাপের মণি পাওয়া গেল। জ্বলজ্বল করছে ! আমরা ছিলাম বান্টিদাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরে এক কাঠের ফরেস্ট বাংলোর ওপর তলায়। পাশাপাশি বাড়ি, তাই বাড়ির সামনেই সবাই মিলে আড্ডা হচ্ছিল। শুতে যাওয়ার খুব তাড়া নেই, আর অভ্যেসও নেই। হঠাৎ শুনি চিৎকার আল উলুধ্বনি ! ভিড় জমে গেল মুহূর্তে। আমরা বাদে পুরো জয়ন্তীতে তখন মধ্যরাত। সারা গ্রামবাসী চোখ কচলাতে কচলাতে এসেছে সাপের মণি দেখতে। সব্বাই পয়সা ছুঁড়ছে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম এক ধারসে !

আমি ব্যাপারটা বোঝার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। মধ্যরাতে তখন উৎসবের মেজাজ। বান্দিদাদের বাড়ির সামনের একফালি উঠোনে ফুচকার দোকান, ঝালমুড়ি বসে গেল। মহিলারা চানটান সেরে চলে এসেছে। এই সব ঘটনাই ঘটে যাচ্ছিল দ্রুত বেগে, প্রায় মিনিট ১৫-র মধ্যেই ! ছোট্ট জায়গা, খবর ছড়ায় বিদ্যুৎবেগেই।

যার বিয়ে, সেই বান্টিদা বরাবরই ডাকাবুকো গোছের, আগেও বলেছি, যে পাগলা হাতির সামনে চলে যায়, নির্ভয়ে। সে 'দেখি ব্যাপারটা' বলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়। মহিলারা হা হা করলেও পাত্তা দেয় না। বান্টিইইইইইই বলে আওয়াজ ওঠে রিভার্ব সমেত। এক বয়স্ক গোছের মহিলা এগিয়ে আসেন, 'দ্যাখ বান্টি, তোকে আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি... তুই আমার ছেলের মতোই',

—কী হয়েছে বলনা ! বান্টিদা খেঁচিয়ে ওঠে।

> বৌভাতের দিন রাতে হাতি এসে বাড়ির পেছনের প্যান্ডেল ভেঙে দিয়ে চলে যায় ! বউ বসে ছিল সিংহাসনে একা, আর সব্বাই ভয়ে যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল ! ব্যস্ এটুকুই !

এই প্রসাদি ফুল, কালীবাড়ির, ... বান্টিদার মাথায় ছুঁয়ে দেয় ! 'ভগবান মঙ্গলময় ! আজ তুই বিয়ে করেছিস, বড় হয়েছিস'।

বান্টিদা আর কথা না বাড়িয়ে সটান ঝোপের মধ্যে এগিয়ে যায়। একটু পরে 'দূর শালা' বলে এক বিরক্তিকর চিৎকার ভেসে আসে !

মহিলাদের চাপা গুঞ্জন ওঠে।

দেখা যায়, ঝোপের ওপর একটা এলইডি লাইট রাখা, আর পেছনে চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছে কুচকুচে কালো পুতুল, বান্টিদাদের বাড়িতে কাজ করত মহা বিচ্ছু এই ছেলেটি। অন্ধকারে তার দাঁতগুলো চকচক করছে শুধু। 'ইয়ে মানে'... আমতা আমতা করে ওঠে পুতুল। তখন সদ্য সদ্য এলইডি আলো বাজারে এসেছে, জয়ন্তীর মতো জায়গায় কেউ চোখেই দেখেনি। এই আলো। বাজুদা শৌখিন লোক, জংগুলে বিয়েবাড়ি, আর লোডশেডিংয়ের আঁতুরঘর বুঝে নিয়ে এসেছিল। ওটা ওদের জন্য বরাদ্দ বাংলোর টেবিলের ওপর রাখা ছিল। দেখা গেল ঝোপের ওপর সেই বাতিটাই জ্বলছিল। বান্টিদা ওর কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে পুতুলকে নিয়ে আসে সবার সামনে, জমায়েতের মাঝে।

মহিলাদের মধ্যে আবার চাপা গুঞ্জন ওঠে।

পুতুল মাথা নিচু করে থাকে। বান্টিদা চেঁচেয়ি ওঠে, এসবের মানে কী !

পুতুল আমতা আমতা করে।

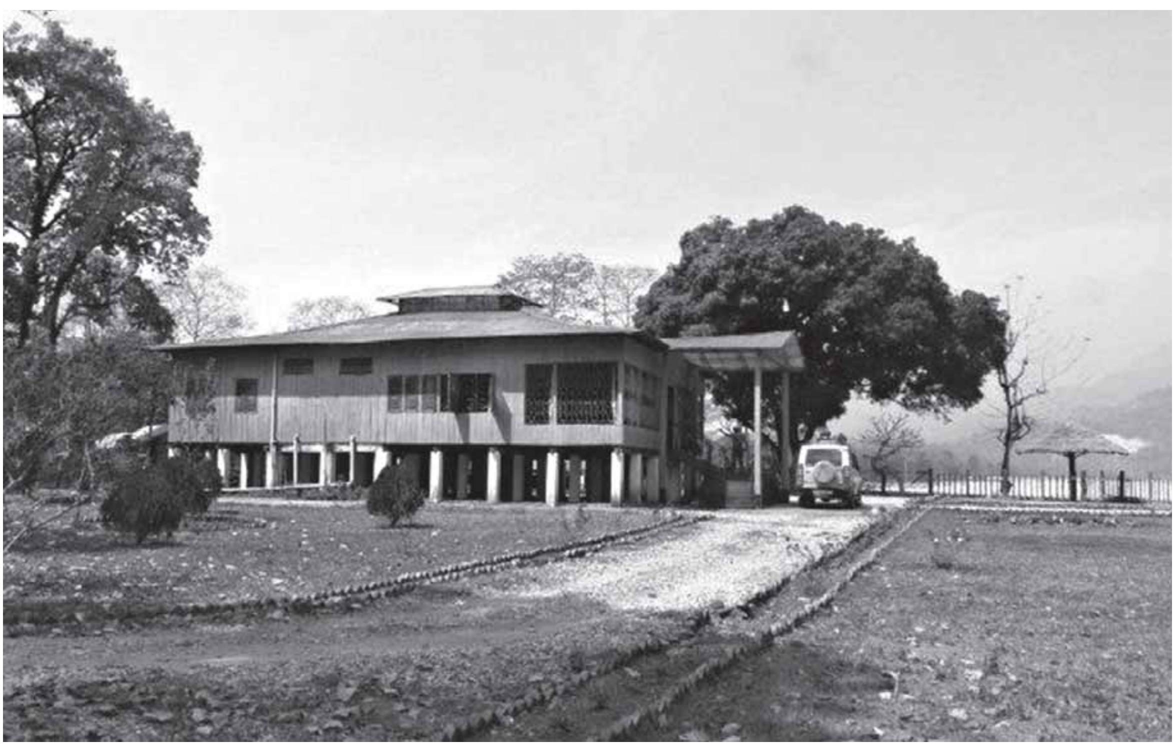

কানটা ধরে জোড়ে মোচড়ায় বান্টিদা।

অ্যাঁ অ্যাঁ করে ওঠে, বলছি বলছি বলছি।

খানিক কেঁদে, খানিক লজ্জায়, খানিক আমতা আমতা করে পুতুল যা বলল, তা বাংলা করলে দাঁড়ায়... রাতে খাওয়ার পর পুতুলের বেদম পায়খানা পেল। এদিকে সেই বাড়ি, ও আশপাশের যত বাড়ি আছে সবার দরজায় দরজায় পুতুল আছড়ে পরে, কিন্তু ঘটনাচক্রে সব বাড়িতেই কেউ না কেউ পায়খানাতেই বসে ছিল। বিয়েবাড়ি উপলক্ষে গ্রামবাসীর ভুরিভোজ চলছিল দু'দিন ধরে। তারই ফলস্বরূপ এই পর্যায়ক্রমে পায়খানা। মুখের ওপর বন্ধ হতে থাকে একের পর এক দরজা! এদিকে ঝড় উঠেছে প্রবল। খর বায়ু বইছে, মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে চারিদিক...।

পুতুল এবার আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। একছুটে ঘরে চলে যায়। বাজুদার টেবিলের ওপর থেকে এলইডি ল্যাম্পটি ছিনিয়ে নিয়ে সোজা ছুটে যায় জঙ্গলের দিকে। তারপরের ঘটনাকে তো মোটামুটি ইতিহাসই বলা যায়। আর এরও পর পুতুলকে কিই বা বলার থাকতে পারে! সব্বাই কিছুই হয়নি এমন একটা ভান করে যে যার বাড়িতে গিয়ে চাদর গায়ে সটান শুয়ে পড়ল। ভারতবর্ষের মতো দেশে পাবলিক টয়লেট অত্যন্তই জরুরি, তা সে জয়ন্তীর গভীর অরণ্য হোক বা পার্ক স্ট্রিটের মোড়!

পর্ব-৩

একটা ছয় ইঞ্চি পাতলা দেয়াল। তার ঠিক ওপারেই ওর দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমি স্থির চোখে চেয়ে আছি হলদে রংচটা দেয়ালের দিকে। আমার ডান দিকে মাম একবার দেয়ালের দিকে তাকাচ্ছে, আর একবার আমার দিকে। পুর্বা আমার জামা শক্ত করে চেপে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে, মাম ওর মুখ চেপে রেখেছে হাত দিয়ে।

আমি মাথা না ঘুরিয়ে আড় চোখে বাঁ দিকে দেখে নিলাম ভেতরবাড়ি যাওয়ার দরজায় বান্টিদা দাঁড়িয়ে আছে। আর আমার ডান দিকে কাঠের একটা পাল্লা খোলা... চোয়াল শক্ত করে খুব ধীরে মাথা নিচু করে বান্টিদা আমায় ইশারায় ডাকল। আমি নড়লেই আওয়াজ হবে, আর একটু শব্দ হলেই... প্রায় ১২ ফুট উঁচু দাঁতাল মদ্দা পাগলা হাতিটা দরজা আর দেয়াল জাস্ট ভেঙে ঢুকে আমাদের পিষে ফেলবে। ওই পাতলা দেয়াল ওর কাছে পিচবোর্ডের খেলনার মতোই।

রাতের খাওয়ার টেবিলেই বসে শুনেছিলাম, কাঠের বাংলোর পেছনের জঙ্গল থেকে এই বিচ্ছিরি রকম বড় দাঁতালটার চিৎকার। শোনা মাত্রই আধখাওয়া ডিম ফেলে ক্যামেরা নিয়ে ছুট দিলাম বান্টিদার সঙ্গে, জাস্ট ৩-৪টে বাড়ি পরে, ফরেস্ট গার্ডের জঙ্গল ঘেঁষা ছোট্ট কোয়ার্টারে। ওর বাড়ির পেছনের জঙ্গলেই নাকি হাতিটা কলাগাছ খাচ্ছে, ব্যাটা জাস্ট দিন দুয়েক আগেই এক বুড়িকে তার ঘর ভেঙে ঢুকে পা দিয়ে থেঁতলে মেরে, চাল খেয়ে পালিয়েছে... বড্ড জ্বালাচ্ছে নাকি এই দাঁতাল!

এহেন সুসময়ে আমি আর বসে ডিম খাই কীভাবে!

কিন্তু গভীর অন্ধকারে, বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি মাম আর পুর্বা হাত ধরাধরি করে ঠিক আমাদের পেছনেই আসছে, হাতি দেখব হাতি দেখব... বলতে বলতে। আমাদের কী আর বলব... জাস্ট গা জ্বলে গেল। কিন্তু তখন আর পেছন ফেরার উপায় নেই, চারদিকেই তো জঙ্গল...

ওদের নিয়েই পায়ে পায়ে ওই নির্দিষ্ট কোয়ার্টারের পেছনের উঠোনে পৌঁছে গেলাম। উঠোনের ওপারেই ঘন জঙ্গল। ওইখান থেকেই মসমস শব্দ ভেসে আসছে... কেউ একটা যেন ফুঁসছে রাগে...

> তখনও জয়ন্তীতে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক পাওয়া যেত না। পিসিও বুধ ছিল একটাই। সেটাও আবার ওষুধের দোকান ও পোলট্রি ফার্মের সাথে। বেশি জোরে কথা বলা যেত না। চ্যাঁচালেই মুরগিগুলো তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠত।

ফরেস্ট গার্ডের তো আমাদের দেখে ভিরমি খাওয়ার জোগার! উঠোনের দিকের দরজা বন্ধ রেখে জানলা একপাটি খুলে উনি উঁকি মারছেন। হাত দিয়ে ইশারায় উঠোনে 'হাতি পালান পালান' বলার চেষ্টা... খুব সন্তর্পনে একপাটি দরজা একটু ফাঁক করে খুলে হাত দিয়ে দ্রুত ইশারায় ভেতরে চলে আসতে বললেন। আমরা দ্রুত দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতেই টের পেলাম পেছনে কালাপাহাড় তেড়ে আসছে ঝোপঝাড় ভেঙে! আমরা ঘরে ঢুকেই বাঁ দিকেই দাঁড়িয়ে পড়লাম হতভম্বের মতো। বান্টিদা এক দৌড়ে ভেতর ঘরের দরজা দিয়ে ভেতর বাড়িতে চলে গেল গার্ডের সঙ্গে। আর ওই কালাপাহাড় এসে দেয়ালের ওপারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর পা দিয়ে মাটি ঘষতে লাগল ক্রমাগত...

আমরা ঘরে ঢুকে বাঁ দিকে গিয়েই পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বুঝলাম, বিচ্ছিরি এক ভুল করে বসেছি। এবার আর কী... স্ট্যচু হয়ে থাক আর কী!

এক একটা মিনিট মনে হচ্ছে এক বছর...

ছয় ইঞ্চি দেয়ালের ওপারেই মৃত্যু! আর এপারে আমরা তিনজন আর শ'দুয়েক মশা।

এভাবে হাতিটাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে পড়ল বোধহয়... আমার দিকে ২০০ মশা হলে ওই ব্যাটার দিকে হাজার খানেক হবেই... আর সে সব রাক্ষুসে মশা, হুল ফুটিয়ে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে সমানে। আর তাছাড়া দেয়ালের আড়ালে থাকাতে ও ব্যাটা কিছুতেই আমাদের দেখতেও পাচ্ছে না, আর সাড়া শব্দ না পেয়ে আরও বিরক্ত। কিন্তু বিরাট ভাগ্য যে গত দিনের মতো ওনার দেয়াল ভেঙে ভেতরে ঢোকার ইচ্ছে হয়নি... বেশ কিছুক্ষণ কাটার পর একবার জাস্ট ভীষণ জোরে হুংকার দিল। মাম এবার কেঁপে চিৎকার দিয়ে উঠল, সঙ্গে পুর্বাও...। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমি মাম আর পুর্বাকে দু'হাতে চেপে ধরে এক ছুট দিলাম ভেতরবাড়ির সদর দরজার দিকে... যাওয়ার সময় এক ঝলক ডান দিকে তাকিয়ে পাতলা কাঠের হাফ খোলা দরজার ওপারে অন্ধকার জঙ্গলের মাঝে আকাশছোঁয়া উচ্চতায় দুটো লাল বিন্দু জ্বলতে দেখলাম। প্রবল জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল সে... আবার এক চিৎকারে রাতের বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট কেঁপে উঠল। তারপর দেখি আস্তে আস্তে ধুলোর ঝড় তুলে, রাতের অন্ধকারে গভীর জঙ্গলে মিলিয়ে গেল দাঁতালটা।

পুনশ্চঃ এই পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে মিনিট পাঁচের মধ্যে আর পুরোটাই আমার ক্যামেরাবন্দি করা আছে! অনেকেই দেখেছে ভিডিওটি। কিন্তু আমাদের তখন মনে হয়েছিল বোধহয় ঘণ্টা খানেক ধরে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু ওখানেই শেষ নয়। হাতি শেষ রাতে আবার ফিরে এসেছিল আমাদের কাঠের বাংলোর নিচে দাঁড়িয়ে লম্ফঝম্প করে গেছে... তখনও আমি বাইরে... হাতির পেছনে... ক্যামেরা হাতে!

তবে মাঝরাতে ফিরে এসে ওই আধ খাওয়া ডিমটা কিন্তু আর খুঁজে পাইনি কোথাও!

পর্ব ৪

সাম্প্রতিক জয়ন্তী যাত্রার গপ্পে আসি এবার।

রাত ঠিক আড়াইটে। ঝমঝম করে বৃষ্টি। জয়ন্তী নদীর রিভারবেড সাদা এক ফালি কাপড়ের মতো পড়ে আছে। বিরাট কাচের স্লাইডিং জানলায় বসে আছি। সামনে একফালি সিমেন্টের উঠোন, তার পরেই নদী। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে জঙ্গল আবৃত করে সারি সারি পাহাড় আর তার চূড়ায় জমে

থাকা মেঘের দল উপস্থিতি জানান দিচ্ছে জমাট ঠান্ডা বাতাসে গা ছমছম করে ওঠে। এই ছোট মায়াময় বারান্দায় পৃথিবীর সব ভাললাগা এসে থমকে আছে। বাকিরাও চুপচাপ। কথা বলছে না কেউই... কিন্তু জেগে রয়েছে সবাই। ভুটান পাহাড় থেকে আবছায়া হাতির ডাক ভেসে আসে। জঙ্গল গন্ধ ছাপিয়ে বোটকা গন্ধ হঠাৎ প্রকট। কে জানে কী এল জল খেতে? মাঝরাতের জয়ন্তীর কুকুরগুলো ডেকে ওঠে তারস্বরে।

রাত ঠিক আড়াইটে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে জঙ্গল আবৃত করে সারি সারি পাহাড় আর তার চূড়ায় জমে থাকা মেঘের দল উপস্থিতি জানান দিচ্ছে জমাট ঠান্ডা বাতাসে গা ছমছম করে ওঠে। এই ছোট মায়াময় বারান্দায় পৃথিবীর সব ভাললাগা এসে থমকে আছে। বাকিরাও চুপচাপ। কথা বলছে না কেউই... কিন্তু জেগে রয়েছে সবাই। ভুটান পাহাড় থেকে আবছায়া হাতির ডাক ভেসে আসে। জঙ্গল গন্ধ ছাপিয়ে বোটকা গন্ধ হঠাৎ প্রকট।

চারদিকের জঙ্গল বড় মায়াময়। বিরাট বিরাট কালো কালো গাছগুলো সারসার দাঁড়িয়ে। মেঘের আবছা আলোয় পাহাড়ের ওপারটা আবার ঝলকায়। আকাশ লাল হয়ে রয়েছে ওদিকটায়।

সরকারি এই বনবাংলো ভয়ংকর সুন্দর। আমাদের বিবাহবার্ষিকীর রাতের নিমন্ত্রণ ঘটনাচক্রে নদীর ঠিক মুখোমুখি জঙ্গলের ঠিক গায়েই, মুখ্যমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত বাংলোর এই ঘরে, এমন এক খাঁটি উত্তর কলকাতার আড্ডাবাজ দাদার পরিবার সাথে।

কেউ বসে আছে মায়াবী মদ হাতে। নেমে গেল ধাপে ধাপে সাদা ভেজা ঠান্ডা বালির চুমুতে। কেউ গিটার হাতে আধ ঘুমে প্লাক করে যায় ঝিম ধরা সুর, যেটা বৃষ্টির মতোই নেশা ধরায়। গান তার আকাশ ছুঁয়ে পৌঁছে যায় ভুটান পাহাড়ের চূড়ায়...

চোখ জ্বালা করছিল, এখন সেই জ্বালা কেটে বেপরোয়া রাতজাগা।

মাঝরাত পার হলে, থেমে গেল বৃষ্টি। পাহাড় চূড়া দেখা যায়, লেপচাখা। ভোর হবে এবার।

পরদিন সারাদিন ঘোরাঘুরি কোন টাওয়ার কত আয়তন, কত বর্গকিমি, অতশত জানি না। জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পরছিল বারবার। আর তাতেই নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল সব্বার। ভারী শ্বাস। সেটা আমাদের না, ঘাড়ের ওপর উকি মারা হাতির, তা শুভই বলতে পারবে। অনন্যা এর আগেও আমাদের সঙ্গে কাজের সূত্রেই জঙ্গলে ঘুরেছে বারবার। গুড্ডুও তাই। অরিজিৎ অবশ্যি আমাদের দলে নতুন। তাও বেশ উৎসাহী। আর আমি তো বিগত ৩-৪ মাস ধরে জঙ্গলের বাসিন্দাই হয়ে গেলাম। তাই এটাই আপাতত আমার ঘরবাড়ি বলা যায়। আমার না বলে আমাদের বলাই ভাল। জঙ্গলের নেশা যে কী ভয়ংকর, তা আগে এতটা বুঝতে পারিনি। এ এক ভয়ংকর প্রেম, ভয়ানক টান।

পর্ব ৫

চোখটোক কোনওরকমে খুলে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কানের পাশে চ্যাঁ চ্যাঁ করে বিচিত্র পোকার আওয়াজ। গুড্ডু আমার পাশেই খুব সিরিয়াস মুখ করে আছে মনে হল, কারণ এই আলকাতরার মতো অন্ধকারে নিজের হাতও দেখতে পাচ্ছি না, তো ওর মুখ দেখব কীভাবে? জয়ন্তীর জঙ্গলে সারাদিন অনেক রোমান্টিক ট্রিপে ছিলাম, সেটা লিখেওছি আবেগ ভরে। কিন্তু এই রাত বারোটার সময় গভীর জঙ্গলের মাঝে দুইজনের অ্যাডভেঞ্চার অভিযান পর্বটা বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

চারদিকেই তো জঙ্গল। গপ্পো করতে করতে চলে এসেছি, কিন্তু যখন হুঁস হল তখন শুধু নিঃশ্বাস নয়, তার সঙ্গে হজম হবার শব্দ, শিরা দিয়ে রক্ত বয়ে যাওয়ার শব্দ, হৃদস্পন্দন শব্দ তো বটেই, সব একসঙ্গে শুনতে পাচ্ছিলাম।

পেছনের দিক থেকে মড়মড় করে আওয়াজ এল। ডালপালা ভেঙে কিছু একটা আসছে! আবার থেমেও গেল। শুভর বাইকটা বাবাবাছা বলে হাতে পায়ে ধরে বাগিয়েছিলাম। এই জঙ্গলে, এই রাতে, জয়ন্তীর মতো জায়গায় একখানি বাইক পাওয়া মানে পাড়ার মোড়ে দীপিকা পাদুকনকে পেয়ে যাওয়া!

অনেক কাকুতিমিনতির পর ও শেষে কড়াভাবে নিদান দিল ‘খবরদার জঙ্গলের দিকে যেও না’... তারপর ভয়েজটা এক দাগ নামিয়ে ‘প্লিজ’।

তখন আমরা কিং অফ জঙ্গল। কোথায় হাতি... কোথায় বাঘ? আমিই হাতি... আমিই বাঘ।

গুড্ডু আমার অ্যাডভেঞ্চার পার্টনার, ওরও ভয়ডর বিশেষ নেই। এক লাফে চলে এল আমার সঙ্গে। বেশ কিছুদূর আসার পর কী মনে হল বাইকের লাইটটা বন্ধ করে দিয়ে দেখি... বাপরে! এবার বাইক স্টার্ট করতে গিয়ে দেখি... ব্যাস... বার কয়েক ঘ্যা ঘ্যা করে চুপ। আমাদের মনে হল এটা বাইক না... অ্যাকচুয়ালি আমাদের হৃদস্পন্দনই বন্ধ হল। বা জীবনের চাকাও বলা চলে! চারদিকে অন্ধকার গলা চেপে ধরেছে। কী যে বিচ্ছিরি রকম অভিজ্ঞতা, কী বলব! ব্যাস দু'জনে গুম হয়ে বসে আছি। গুড্ডুরও গলা দিয়ে বিশেষ আওয়াজ বের হচ্ছে না। মাঝে মাঝে পেট ডাকছে খিদেতে। তারপর রাক্ষুসে মশাগুলো পালে পালে প্যাঁ প্যাঁ করে চলেছে চারিদিকে।

এর... শেষটা আমার মনে নেই। শেষ অবধি আর ফিরতেই পারিনি বোধহয়!

অভ্রদীপ ঘটক

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শনি বেলা ১ টা থেকে রাত ৯টা।

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

ধারাবাহিক কাহিনি

তরাই উৎরাই

৬০

উপেনের সঙ্গে সাক্ষাতের তিন মাস পর হিদারুর জামিন হওয়ার সংবাদ পেল গগনেন্দ্র। এর কিছুদিন পর একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দিল শোভা। বাবা তাঁর ছেলের নাম রাখল উপেন্দ্রকিশোর। সে ছেলে এখন টলোমলো পায়ে দৌড়োতে ব্যস্ত মাথাভাঙ্গায়।

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাস। পিডাব্লুডি আপিসের পেছনে মিউনিসিপ্যালিটির পাব্লিক রিডিং রুম থেকে চিন্তিত মুখে বেরিয়ে হিদারু দেখল পাশেই শিবাজী ময়দানে একপাল ছেলে হকি খেলছে। সবার হাতে অবশ্য হকি স্টিক নেই। স্টিকের অভাব মেটান হয়েছে লাঠি দিয়ে। টাউন এখন সব দিক থেকেই ঠান্ডা। কংগ্রেসের আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েছে। পুলিশের নজরদারিতে ঢিলেঢালা ভাব। সে সবের মধ্যেও ট্রেডিং ব্যাঙ্কের সত্যেন সেনের বাড়িতে হানা দিয়েছিল পুলিশ। সেনবাবুকে না পেয়ে ওনার মেয়ে সুকুমারীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছিল। সোনাউল্লা স্কুলের হেড পন্ডিত গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং সেই কারণে তাঁকে স্কুল থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে। লেবং নামক জায়গায় গভর্নরের ওপর গুলি চালানর চেষ্টা হয়েছিল। সে ঘটনায় জড়িত থাকার কারণে রবি শিকদারের জেলজীবন এখনও শেষ হয় নি। আইন অমান্য আন্দোলনের পলাতক নেতারা কেউ কেউ ফিরতে শুরু করেছেন।

গোপাল ঘোষের কাঠের গুদামের ম্যানেজার হয়ে দিন কাটাচ্ছে হিদারু। ভাবা গিয়েছিল যে জামিন পেয়ে ফিরে আসার পর হিদারু রাজনৈতিক কর্মকান্ডে আরো বেশি জড়িয়ে পড়বে— কিন্তু তেমন কিছু ঘটে নি। উপেন বর্মনের উৎসাহে সে একটা ক্লাব চালু করেছিল। নাম ঠিক করা হয়েছিল 'রাজবংশীয় স্বদেশী সমিতি'। গোপাল ঘোষে তাঁর গুদামের একপাশে একটা ঘর বানিয়ে দিয়েছিলেন সমিতির আপিস হবে বলে। সে আপিসে মাঝে মধ্যে কয়েকজন এসে গল্পগুজবও করে। কাজের কাজ বলতে কিছু হয় নি এখনও। এর বাইরে কংগ্রেসের ভলেন্টিয়ার হিসেবে টুকটাক দায়িত্ব পালন। টাউনের কংগ্রেস অবশ্য এখন মহা ব্যস্ত পার্টি আপিসের উদ্বোধন নিয়ে। পান্ডাপাড়ায় জমি কিনে আপিস হয়েছে। অবশ্য জমি কেনার খরচ পড়েছিল মাত্র এক টাকা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ হকি খেলা দেখল হিদারু। তারপর চৈ বাড়ি বাগানের হেড আপিসের পাশ দিয়ে হেঁটে করলা নদীর পুল পাড় হতে গিয়ে দেখল নিতাইবাবুকে। লোকটিকে বেশ লাগে হিদারুর। টাউনে রবি ঠাকুরকে আনার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে গত কয়েক মাস দেখা হয় নি তাঁদের।

পুলের রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়ে নদীর মধ্যে কিছু একটা দেখছিলেন নিতাইবাবু। হিদারুকে দেখে হাসিমুখে হাত নাড়ালেন।

'কী দেখছেন?' হিদারু জিগ্যেস করল। বিকেল গড়িয়ে আসছে।

'কিছু না।' নিতাইবাবু হাসলেন। 'দড়িতে ঝোলান পুলটা একটু একটু দোলে। এ ভাবে থাকলে দুলুনিটা ভালো বোঝা যায়। বেশ লাগে মশাই!'

'আপনি সত্যি পারেনও!' হিদারু হেসে ফেলল। 'রবি ঠাকুরের ব্যাপারটা কী হলো?'

'সমস্যা তো একটাই। বোলপুরে যাওয়ার লোক পাচ্ছি না। আপনি যাবেন?'

'আমি?' হিদারু আবার হাসল। 'কী যে বলেন!'

'আপনি তো ফেমাস লোক! পুলিশ পিটিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলেন! ঘটনাটা নিয়ে কিন্তু একটা প্লে হতে পারে।'

'জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলাম বুঝি?' হিদারু কৌতুক বোধ করে।

'তাই তো শুনেছি গোপাল ঘোষের মুখে।'

'জঙ্গলেই ছিলাম। তবে থাকার জন্য ব্যবস্থা ছিল।'

'বাঘ দেখেছেন?' নিতাই পাল আগ্রহের সুরে জানতে চান। 'ওয়াইল্ড অ্যানিমাল আর কী কী দেখলেন?'

হিদারু কিছু না বলে একটু হাসল। সে জানোয়ার তেমন দেখেনি। কিন্তু যা দেখেছে তা এক বিচিত্র দেশ। চায়ের দেশ। মাইকেল মুন্ডা, গঙ্গা ওঁরাও নামের কালো কালো মানুষের দেশ। গা ছমছমে গহীন জঙ্গলের মাঝে সবুজ চা গাছের গালিচা, খুচরো পয়সার স্তূপ নিয়ে শ্রমিকের মজুরি দিতে বসা বাগানবাবু, দোর্দন্ডপ্রতাম ম্যানেজার, বাগানের হাট, চাঁদনি রাতে টি লেবারদের বস্তি থেকে ভেসে আসা অচেনা-অদ্ভুত সুর, ভৌতিম দ্রিম দ্রিম ধ্বনি, আকাশে হেলান দিয়ে থাকা আশ্চর্য পাহাড়, তার মাথায় সাদা মুকুট, বাগানবাবুদের ঘড়ির কাঁটায় মাপা জীবন সমেত আরো কত কী! সামান্যই দেখেছে। কিন্তু সেই সামান্য দেখাটাও এত বড়ো যে নিতাই পালকে তা বুঝিয়ে বলা যাবে না। হয় তো রবি ঠাকুর হলে পারতেন।

'যা দেখেছি তা জানলে আপনি সেরা পালাটা লিখতে পারতেন।' হিদারু বলল। নিতাই পাল কৌটো খুলে সিগারেট বের করে জ্বালিয়ে বললেন, 'একদিন তবে নোটবুক আর কলম নিয়ে আপনার বাড়ি আসব।'

আরো দু চার কথার পর হিদারু এগিয়ে গেল। যে চিন্তাটা নিয়ে সে রিডিং রুম থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেটা সেটার উদয় একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদ পেয়ে। রিডিং রুম লাগোয়া ছোট ক্যান্টিনে খবরটা তাঁকে দিয়েছিল সমাজ পাড়ার হোড় বাড়ির ছেলে বিমল। এ বছরই সে ফণীন্দ্রদেব স্কুল থেকে ভালো ভাবে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কথায় কথায় বিমল বলেছিল, 'শুনলাম উপেন বর্মন নাকি টাউনের বসবাস তুলে দেবেন ভাবছেন।'

বাস্তবেই উপেন্দ্রনাথ বর্মন বেশ সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। নানা কারণে বাজারে অনেক ধার হয়ে গেছে। আইন ব্যবসাতেও মন দিতে পারছেন না। ভূ সম্পত্তি নিয়েও চলছে প্রবল গোলমাল। কিন্তু সে কারণে তিনি টাউন ছেড়ে চলে যাবেন, এটা হিদারুর কাছে অভাবনীয় ছিল।

'আবার কেউ কেউ বলছে যে ভারত শাসন আইনে রিফর্মেশন হয়েছে। এর মধ্যেই ইলেকশান হবে। হরি গাঙ্গুলি ওনাকে ইলেকশানে কনটেস্ট করার কথা বলেছেন। জলপাইগুড়ি আর শিলিগুড়ি সাব ডিভিশন এরিয়ায়।' বিমল হোড় জানিয়েছিল।

নির্বাচনের ব্যাপারে অবশ্য হিদারু বিশেষ কিছু জানে না। আসলে সে কয়েক দিন ধরে ভাবছিল উপেন বর্মনের সঙ্গে দেখা করবে। তিনি হিদারুকে ভালোবাসেন। হিদারুর কদমতলার বাড়িতে এসেছিলেন একদিন। হিদারু তখন সদ্য সদ্য জামিন পেয়ে ফিরে এসেছিল। পুলিশ পিটিয়ে ফেরার থাকার ঘটনাটি ঘটিয়ে হিদারু বেশ খানিকটা কাছে চলে এসেছে তাঁর। বিমল হোড়ের দেওয়া সংবাদটি তাই চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল।

তবে চিন্তা একটা আগে থেকেই খোঁচা দিচ্ছিল হিদারুকে। সেটা নিয়েই আলোচনার করবে বলে ভেবেছিল উপেন বর্মনের সঙ্গে। বিষয়টা একটু জটিল। পঞ্চানন বর্মা দেশীয় মানুষদের উপবীত ধারণ করে ক্ষত্রিয় হওয়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করলেও হিদারু কিংবা তাঁর পরিবারের পুরুষেরা কেউ এখনও উপবীত ধারন করে নি। এ নিয়ে ক্লাবের সভ্যদের সঙ্গে তাঁর মাঝে মাঝেই তর্ক হয়। হিদারু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে যে দেশী সমাজে যাঁরা মুসলমান, তাঁদের পক্ষে পঞ্চানন ঠাকুরের নির্দেশ মানা অসম্ভব। গ্রামে হিন্দু আর মুসলিম রাজবংশী মিলেমিশে একই উঠোনে থাকত। এখন কোথায় জানি একটা বিভেদ চলে আসছে।

জলপাইগুড়ি টাউনে মুসলিমরাই সংখ্যায় বেশি। টাউনের পুরনো মুসলিমরা সবাই কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলেও নতুন আসা মুসলিমরা দলে দলে লীগে যোগ দিচ্ছে। অবশ্য এ নিয়ে টাউনে কোনও রেষারেষি, ঝামেলা হয় নি। মেলামেশাতেও প্রভাব পড়ে নি কিছু। কিন্তু কোথাও একটা দেয়াল তৈরি হচ্ছে। হিদারু সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারে না, কিন্তু টের পায়। মুসলিমদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে বাড়াবাড়ির ব্যাপারটা ভাটির দেশের লোকের মধ্যেই দেখা যেত এতদিন। এখন হিন্দু রাজবংশীদের মধ্যেও প্রবেশ করছে। চায়ের দেশের সেই কালো কালো লোকগুলোর মধ্যে একটা জিনিস দেখেছিল হিদারু। সেখানে হিন্দুও নেই, মুসলিমও নেই।

কিন্তু উপেন বর্মন যদি টাউন ছেড়ে চলে যায় তবে এসব নিয়ে কার সঙ্গে আলোচনা করবে হিদারু?

বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতেই বউ হুকুম দিল যে রমেশ মাস্টারকে যেন অবিলম্বে টাটকা পুঁইশাকগুলো দিয়ে আসা হয়। হিদারুর রায়কতপাড়ার বাড়ি থেকে কেউ এসে একগাদা পুঁইশাক দিয়ে গেছে। বড়ো ছেলে চিত্তকে পড়িয়ে রমেশ গুপ্তভায়া কিছুই নেয় না বলে তাঁকে প্রায়ই এটা ওটা পাঠানর চেষ্টা করে হিদারুর বউ। কিন্তু নিয়ে যাওয়ার লোক পাওয়া যায় না। আসলে এসব নিয়ে গেলে রমেশ মাস্টার গম্ভীর হয়ে যান বলে হিদারু আর তাঁর ছেলে কিছু নিয়ে যেতে সঙ্কোচ বোধ করে। চিত্তকে নিয়ে রমেশ গুপ্তভায়া খুব আশাবাদী। চিত্তও তাঁর বাধ্য ছাত্র।

বউ-এর হুকুম অগ্রাহ্য করে ঘরে ঢুকল হিদারু। কয়েক মাস হলো টাউনে বিদ্যুৎ এসেছে। সুভাষ বোস এসে উদ্বোধন করে গেছেন পাওয়ার হাউস। টাউনের অনেকেই লাইন নিয়েছে। হিদারুও ভাবছে নেবে। খরচ অবশ্য ভালোই। কিন্তু ছেলের কথা ভেবে সেটা নিতে হবে। গোপাল ঘোষ বলেছেন যে তিনি হিদারুকে বিনা সুদে কিছু ধার দেবেন এ ব্যাপারে। চিত্তকে তিনিও খুব ভালোবাসেন। চিত্তর জন্য তাঁর অবারিত দ্বার।

বাইরের ঘরটা অন্ধকার হয়ে আছে। দরজার কাছে একটা কুপি জ্বলছিল। হিদারু ভাবল এই হাই ওয়াটের বাল্ব লাগাবে। সে অন্ধকারের মধ্যেই দেখতে লাগল ঘরটাকে। স্পষ্ট দেখতে পেল তাঁর চিত্ত উকিলবাবু হয়ে পেল্লায় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে বসে আছে। ঘর ময় সেলফ ভর্তি বই। মাথার ওপরে পাখা ঘুরছে। নেমপ্লেটে লেখা, চিত্ত রায়। অ্যাডভোকেট। পরামর্শের ফি ষাট টাকা। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বত্রিশ শো টাকা দামের শেভ্রলে গাড়ি।

বউ এসে মোমবাতি দিয়ে গেল। বাইরের ঘরে একটা তক্তপোষ ছাড়া আর কিছু নেই। তার এক কোনে চিত্তর বইখাতা গোছান। একটা খাম পড়ে আছে মাঝখানে। চিঠি? হ্যাঁ চিঠিই। তাঁর নামে।

ঠিকানার লেখা দেখেই মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল হিদারুর। গগনের চিঠি। অনেক দিন পর।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

ডুয়ার্স থেকে শুরু

রাঙা কুয়াশা, তোর জন্য

বাতাসে শীতের হিমেল স্পর্শ থাক চাই না থাক, মহানগরীতে বিলিতি নববর্ষ উদ্‌যাপনের বম্ব ব্লাস্টিক জাঁকজমক থাকবেই থাকবে। এভাবেই একটার পর একটা বছর বদলে যায়। দরজায় কড়া নাড়ে নতুন সম্ভাবনার নানা প্রতিশ্রুতি। কিন্তু কিছু কিছু নিঃশব্দ পরিবর্তনের আড়ালে যে ধীর বিষক্রিয়া ঘটে চলেছে, তা যেন দেখেও দেখতে নেই। যেমন, আবহ ও পরিবেশে কুয়াশার রূপটান কার অদূরদর্শিতায় আজ এত অভাবী, সে কি আর জানা নেই আমাদের? কিন্তু জানা থাকলেও বেনিয়মের হানাদারিতে কোনও মানা নেই। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে একবার করে বর্ষ বদল ঘটেই চলবে। কিন্তু আমরা আর কবে বদলাবো সঠিক উৎকর্ষের লক্ষ্যে? যদিও বাতুলতা, কিন্তু তবুও সে প্রসঙ্গই উত্থাপিত হল, আজকের পর্বে।

একটি মানব শিশুর জন্ম চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনও প্রহরেই হতে পারে। কিন্তু একটি নতুন বছরের জন্ম সব সময়ই হতে হবে একদম কাঁটায় কাঁটায় মধ্য রাতে। আর সেই জন্মমুহূর্তের সাক্ষী হতে চেয়ে বিশ্বজুড়ে যে অসংখ্য চক্ষু সেদিন জেগে থাকে, তাদের সবাই যে চৈতন্যে থাকবে তেমন কোনও কথা নেই। বরং হিসেব করলে দেখা যাবে এই মাহেন্দ্রক্ষণটির সুবাদেই হয়ত সারা দুনিয়ায় সেদিন মিনিট প্রতি সব চেয়ে বেশি সংখ্যক মদের বোতলের ছিপি খোলা হচ্ছে।

যাই হোক। এইভাবে সঠিক প্রোটকল মেনে থার্টি ফার্স্ট নাইটে যে সকল মানুষ, বারোটা বেজে এক মিনিটে হই হই করে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' বলে থাকেন, তাদের জীবনে পুরনো বছরের সর্বশেষ রাত্রিটি টেকনিক্যালি ঘুমহীন। আর নতুন বছরের শুভ সূচনা হয় অল আউট হয়ে ঘুমোতে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে। চারপাশের হাল হকিকৎ দেখে, আমি এই উপলব্ধিতে পৌঁছলাম, ঘড়ির কাঁটা রাত বারোটা পেরোনোর মিনিট দশেক বাদে। জীবনে সেই প্রথমবার গ্ল্যামারে মোড়া এক নিউ ইয়ার পার্টি চাক্ষুষ দেখছি। খাদ্য পানীয় গ্রহণের সুবাদে, মোটের ওপর তার অংশও হয়েছি। ঘটনাস্থল, তাজ বেঙ্গল হোটেলের ক্রিস্টাল রুম। ঘরের চারদিকেই দেয়াল ঘেঁষা অঞ্চলগুলোয় স্থান পেয়েছে মোটা কাপড়ের খোলস পড়া সারি সারি চেয়ার। বুফে টেবিল থেকে প্লেট ভরে সুখাদ্য নিয়ে এসে, এখানে বসে অতিথিদের পেট ভরানোর ব্যবস্থা। আর ঘরের মধ্যিখানটা পুরোপুরি ফাঁকা।

নাচানাচি হই হুল্লোড়ের মুক্তাঞ্চল। যার চূড়ান্ত পর্ব এই খানিকক্ষণ আগে সাঙ্গ হতে দেখলাম, বছরটি বদলের ব্রাহ্মমুহূর্তে।

তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার মতোই মহার্ঘ্য এক মেনু সাজানো ছিল বুফে টেবিলে। কিছু কিছু করে সেগুলো সবই প্লেটে স্তূপ করে এনে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছি। আরর নজর রাখছি পাশের চেয়ারে বসা নেতিয়ে পড়া রাজুর ওপর। এখন দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন, যে খানিক আগে এই একই ব্যক্তি শূন্যে এক ঠ্যাং তুলে, সর্বশক্তি প্রদর্শন পূর্বক, বিচিত্র এক দোআঁশলা নৃত্যকলা প্রদর্শন করছিল। আপাততঃ তার দু' চক্ষুর শাটার একেবারে ডাউন। শিরদাঁড়াটি বেঁকে রয়েছে অবিকল 'খুড়োর কল' ছড়াতে সুকুমার রায়ের আঁকা খুড়োর মতো। হাতে ধরা নান রুটি আর মটন কষার প্লেটখানা সে মিনিট দুই আগেই মেঝেতে নামিয়ে রেখেছে, যাতে নিশ্চিন্তে বিনা ঝামেলায় ঝিমোতে পারে। এবং তাকে যেন তেন প্রকারণে জাগাবার চেষ্টা করলে, চোখ বোঁজা অবস্থাতেই আঙুল তুলে চোস্ত ইংরেজিতে সে একটিই বাক্য বলছে, —জাস্ট ওয়ান মিনিট! আই উইল বি ব্যাক সুন।

হাতের প্লেট নামিয়ে রাখার মুহূর্তে সে প্রথমবার এই ডায়লগখানার আশ্রয় নিয়েছিল। এবং তারপর থেকে সব প্রশ্নের জবাবে ওটারই ফাটা রেকর্ড বাজছে।

শুধু আমি নয়, ওর দিকে এই মুহূর্তে আড়চোখে নজর রাখছে ইতি উতি ঘুরে বেড়ানো সুবেশ পোশাকধারী কয়েকজন ব্যাঙ্কোয়েট কর্মীও। তার কারণ, নাচানাচি শুরু করার অনেক আগেই রাজু নিজের বিশেষত্ব বিশেষভাবে বিজ্ঞপিত করে ছেড়েছে। পার্টির প্রথম প্রহরে সে সময়, আমাদের দলের আরও দু'তিন জন আনাড়ি তড়িঘড়ি বেশ কিছু পেগ চড়িয়ে ফেলে টয়লেট খুঁজে হয়রান হচ্ছিল। সমাধানের আশায় তারা রাজুর শরণাপন্ন হলে, রাজু দায়িত্ব সহকারে তাদের সবাইকে মিছিলের আকারে সঙ্গে নিয়ে এই পাঁচ তারা হোটেলের কিচেনের দোরে পৌঁছে যায়। ভেতর থেকে গরম গরম কাবাবের গন্ধ ভেসে আসছে দেখেও ও নিবৃত্ত হতে নারাজ। অগত্যা তখন, ব্যাঙ্কোয়েট কর্মীরা ওকে বৃত্তের আকারে ঘিরে ধরে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে এনেছিল।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, এই পার্টির উপলক্ষ্য শুধুমাত্র নিউ ইয়ার উদ্‌যাপন নয়। একটি নতুন বাংলা সংবাদপত্র (অধুনালুপ্ত) চালু করার ইচ্ছে নিয়ে সে বছর কলকাতায় এসেছিলেন মুম্বাইয়ের এক হীরক ব্যবসায়ী। তাই পার্টিটি এক অর্থে শহরের গণ্যমান্যদের মধ্যে তার আগমনবার্তা ঘোষণার মঞ্চও। আমাদের বিজ্ঞাপন এজেন্সি ওদের পুরো পাবলিসিটি ক্যাম্পেনটি সামলাচ্ছিল। ফলে সে সুবাদেই আমরা, এজেন্সির জুনিয়ার ব্যাচ, সহর্ষে দঙ্গল বেঁধে, ফাঁকতালে তাজ বেঙ্গল দর্শন করতে চলে এসেছিলাম, বর্ষ বরণের সেই রাতে।

—চল রে, এবার বাড়ি যাই। ঘুমোতে হবে!

পার্টির ভিড় ছেড়ে বেরিয়ে এল সৌগতদা। ঠিক মতো ব্যালেন্স বজায় রাখার জন্য তাকে এমনভাবে দু'হাত ডাইনে বাঁয়ে দোলাতে হচ্ছে, যে দেখে মনে হবে বাতাসে সাঁতার কাটা চলছে।

ক্রিস্টাল রুমে তখন অনেককেই অমন দম ফুরনো লাট্টুর মতো টাল খেতে দেখছি। অবশ্য আমি নিজে টাল খাচ্ছি বলে গোটা ঘর সমুদ্রের ঢেউ হয়ে উঠেছে কি না সেটাই বা কে বলবে? দুয়েক জায়গায় মানুষেরা ফুলের তোড়ার মতো গুচ্ছ হয়ে একে অপরের ওপর হেলে দাঁড়িয়ে আছেন। যে দৃশ্য মনে পড়ায় তারাপদ রায়ের গল্পের সেই বিখ্যাত দুটি মাতালকে, যারা গলা জড়াজড়ি করে রাতের পথে হাঁটতে হাঁটতে স্লোগান দিচ্ছিল, 'ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড... ডিভাইডেড উই ফল!'

— কি রে চল! যাবি না?

সৌগতদা আমার কাঁধ খামচে ধরল এবং আমরা দু'জনে সেই ক্ষণেই প্রশ্নাতীতভাবে ইউনাইটেড হলাম। সৌগতদা আমার বস। যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট ভারী। ফলে তার সেই চাপে নিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে আমার হাবুডুবু দশা! গোটা ঘরটাই রাউন্ড ট্রলিতে আমাদের চারপাশে ঘুরছে মনে হতে লাগল। হাতের কাছে নির্ভরতার একমাত্র অবলম্বন বলতে অকেজো রাজু। চেন রিঅ্যাকশনে আমি তার কাঁধ খামচে ধরতেই রাজু খেঁকিয়ে উঠে জড়িত স্বরে বলল, যত্ত সব পেঁচো মাতাল। চলো, চলো... আমি সবাইকে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসছি!

টলমল করে উঠে দাঁড়াল রাজু। এবং বিনা বিলম্বে আমাকে আর সৌগতদাকে দু'হাত মেলে এমন জড়িয়ে ধরল যে মনে হবে, নিউ ইয়ার ইভ নয়, এটা নির্ঘাত বিজয়া দশমী!

—লক্ষণ ভাল নয়...

সৌগতদা বিড়বিড় করে বলল। আমরা তিনজনে তখন একে অন্যের ভারে বিনা ব্রেকের নাগরদোলা হয়ে স্লো মোশানে নিজেদেরই কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছি। তিন মাথা এমনভাবে এক হয়ে আছে, যে বাইরে থেকে দেখে মনে হবে, বাবা, না জানি কি না কি গোপন কুবুদ্ধি আঁটা চলছে!

রাজুর কানের কাছে মুখ নিয়ে এবারে দাঁত কিড়মিড় করে সৌগতদা সাবধানবাণী আওড়াল, বমি করলে বহুত মার মারব কিন্তু... চল ব্যাটা, বাইরে চল...

রাজু বলল, জাস্ট আ মিনিট... আই উইল বি ব্যাক সুন!

বলা মাত্রই আমাদের ঘাড়ে দ্বিগুণ ভার। কারণ বাবু আবার বিনা নোটিশে অন্য মার্গে গমন করেছেন। ভারী নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সৌগতদা বলল, ধুর ভাল্লাগে না! স্বর্গের নেশার মধ্যে মর্গের লাশ!

আমি একমত হয়ে মাথা নাড়লাম। তারপর বললাম, আমরাও কেলিয়ে পড়ার আগে, এটাকে চটপট বাইরে নিয়ে যাই চলো!

অতঃপর, বল ড্যান্স করার ভঙ্গীতে পা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে আমরা রওনা হলাম মহাপ্রস্থানের পথে। ওঃ! মনে রাখার মতোই নিউ ইয়ার ইভ বটে!

এরকম দশায় সাধারণত দ্বিপদ প্রাণী থেকে অবিলম্বে চতুষ্পদ হয়ে পড়ার এক অতি প্রবল টেন্ডেন্সি মাথা চাড়া দেয়। হামাগুড়িকে মনে হয় বিশ্বের সব চেয়ে কাম্য ও নিরাপদ পরিবহণ। কিন্তু না। তাজ বেঙ্গলের লবিতে এমন ভয়ংকর নজির স্থাপন করা সম্ভব না। অতএব, অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হল। ছোটবেলার সচিত্র গল্পের বইতে যেভাবে রাজা বিক্রম-কে বেতালের শব পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে ছবিতে হাঁটতে দেখেছিলাম, প্রায় তারই অন্ধ অনুকরণ করে, রাজুসহ তাজবেঙ্গলের পোর্টিকোতে বেরিয়ে এলাম আমি আর সৌগতদা। বড় বড় পাগড়ি পড়া দ্বাররক্ষকরা তখন সেখানে মাইক ফুঁকে ফুঁকে গাড়ির নম্বর ঘোষণা করছে। আর নিঃশব্দে একটার পর একটা গাড়ি এসে হাজির হচ্ছে পোর্টিকোতে অপেক্ষামান রহিস আদমিদের পিক আপ করে নিয়ে যেতে। অতি সুশৃঙ্খল সেই সিস্টেমের মাঝখানে আমরা এসে পড়ায় পুরো ব্যবস্থাটা খানিকক্ষণের জন্য একদম গোল্লায় চলে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এমন ঠিক ঠিকানাহীন ভাবে আমরা তিন মূর্তি প্রথম গাড়িটির পথ রোধ করে দাঁড়ালাম, যে কোড অফ কনডাক্ট ভঙ্গ করে গাড়ির ড্রাইভার বাধ্য হয়ে হর্ন বাজিয়ে বসল। আর সেই হর্ন শুনে চমকে জেগে উঠল রাজু। চোখ মেলে তাকিয়ে পরিস্থিতি দেখে সে কি বুঝলো কে জানে! হঠাৎ ভীম শক্তিতে আমাদের হাত ছাড়ানোর জন্য ছটফটিয়ে উঠে বলল, আঃ! ছাড়ো, আমাকে ছাড়ো। আমি নিজেই তো গাড়িতে উঠতে পারি!

সেই গাড়ির মালিক, এক সুবেশ দম্পতি তখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছেন। একজন হোটেল কর্মী আগে থেকেই মসৃণভাবে এসে, বিনীত ভঙ্গীতে গাড়িটির দরজা খুলে ধরে দাঁড়িয়েছিল তাদের জন্য। রাজুর উগ্র ভাবগতিক দেখে, দুরন্ত উপস্থিত

বুদ্ধির পরিচয় দিল সে। সাবধানের মার নেই ভঙ্গীতে, দুম করে দিল গাড়ির দরজা বন্ধ করে।

—আ মরণ! কি মিস টাইমিং দেখো!

ব্যাপার দেখে রাজু বীতশ্রদ্ধ স্বরে মন্তব্য করল। এবং ক্রমাগত সন্দেহ প্রকাশ করে চলল যে আজ হোটেলের এক ডজন নিউ ইয়ার পার্টিতে যত মদের বোতল বরাদ্দ হয়েছে, এরা তার থেকে অনেকটাই সরিয়ে ফেলে ফাঁক বুঝে নিজেদের গলায় ঢেলেছে। নাহলে, গাড়ির দরজা বন্ধ করতে এমন মিস টাইমিং হয় কখনও?

ওর সেই বক্তৃতা চলার ফাঁকেই অবশ্য ভুলিয়ে ভালিয়ে আমরা ওকে হোটেলের গেটের বাইরে নিয়ে চলে এসেছি। রাস্তার উলটোদিকে চিড়িয়াখানার গেটটা এবারে তার নজরে পড়তেই আরেক নতুন বিপত্তি। চিড়িয়াখানায় কেন নাইট শো হয় না? চলো রিকোয়েস্ট করে দেখা যাক, ঢুকতে দেবে কি না...।

সেই বায়না থামিয়ে, ওকে নিরস্ত করতে আমাদের তখন কথা দিতেই হল যে সূর্য উঠলে আমরা আবার এখানে ফিরে আসব চিড়িয়াখানা দেখতে। মানে, পয়লা জানুয়ারির শুরুতেই একটি সাদা মিথ্যে বলে তারপর অবশেষে রাজুকে ট্যাক্সিতে তোলা সম্ভব হল।

চিরকাল দেখেছি পয়লা জানুয়ারির সকালে সুন্দর একটা কুয়াশা দেখতে না পেলে আমার মেজাজটা কিছুতেই ঠিক চনমনে হতে চায় না। আসলে একদম শৈশবকাল থেকে প্রথম যৌবনের বয়স অবধি এটাই একটানা অভ্যেস হয়ে গেছে ডুয়ার্স থেকে। সেখানে ডিসেম্বরের সলতে পুড়ে শেষের দিকে চলে এলে, প্রতি বছরই কপালে বরাদ্দ থাকত অন্তত ছয় থেকে সাত দিন ব্যাপী একটানা ছাই রঙা কুয়াশা। যার প্রভাবে শহর, শহরতলি ও পাহাড়তলি জুড়ে সৃষ্টি হত বেশ রোমাঞ্চকর এক রঙমঞ্চ। সেই ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশার কী অদ্ভুত জাদু! দিনের আলো পর্যন্ত তার দাপটে কম দেখায়। আবার রাতে, স্ট্রিট ল্যাম্প কিংবা চাঁদের আলো তার পাল্লায় পড়ে অতিরিক্ত উজ্জ্বল। সেরকম আবহাওয়ায় ইংরেজি সিনেমায় দেখা কোনও শহরের সঙ্গে অনায়াসে মিলে যায় আমাদের চারিপাশটা। এবং সেই সব সিনেমার চরিত্রদের মতো যখন আমাদের নিঃশ্বাস থেকেও অবিরাম ধোঁয়া নির্গত হতে থাকে, তখন মনে হয়, এই সময়টায় জমিয়ে কিছু একটা অ্যাডভেঞ্চার না করাটাই এক মস্ত পাপ!

শহর কলকাতায় অবশ্য ওই জিনিস বেশ দুর্লভ। যেটুকু শীত পড়ে সেটাও ছানা কাটা দুধের মতো। গৃহস্থের বাগানে গরু ছাগল ঢুকে পড়লে যেমন ডান্ডা হাতে তাকে তাড়াতে রে রে কেউ না কেউ ছুটে যায়, তেমনই উত্তরের বাতাস একটু আধটু কামড় নিয়ে হাজির হতেই বঙ্গোপসাগরের একগুঁয়ে কোনও ঝঞ্ঝা ছুটে আসে তার দফারফা করতে।। প্রতিবছর এই একই লুকোচুরির কর্মসূচি দেখে আসছি যতদিন ধরে এ শহরে আছি। এমন কী এই সিজনে খবরের কাগজের শীত বিষয়ক হেডলাইনও আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। একবার বলবে, এই সপ্তাহের শেষ থেকে ভাল মতো পারদ পতন ঘটবে। দু'দিন বাদেই আবার বলবে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত থাকুন, এই সপ্তাহের শেষে শীত পাততাড়ি গোটাবে! পার্কেরর

অর্জুন
সিরিজের এক প্রচণ্ড রংচঙে
এবং সশব্দ চরিত্র হল মেজর।
টিনটিনে যেমন ক্যাপ্টেন হ্যাডক, ফেলুদায়
যেমন লালমোহনবাবু... বিরিয়ানিতে যেমন
মশলা মাখা আলু... অর্জুনের গল্পে মেজর খানিকটা
তাই। সমরেশদা চেয়েছিলেন ওই চরিত্রটি করুন
দীপঙ্কর দে। প্রোডাকশন হাউস থেকে সেই মতো
যোগাযোগও করা হয় ওনার সাথে। উনি রাজি,
জেনে আমার আহ্লাদের সীমা নেই। চোখের
সামনে ভাসছে 'বাঞ্ছারামের বাগান'
সিনেমাটি।

ঢেঁকিতে বসে বাচ্চারা যেমন ওঠানামা করে, দক্ষিণবঙ্গে শীতকালের হালটাও ঠিক তাই।

তবে শীতের অভাব যতই থাকুক, শীত কেন্দ্রিক হুজুগের কোনও অভাব নেই। ডিসেম্বরের শেষদিক থেকেই রংবেরঙের সোয়েটার জ্যাকেটে আবৃত মানুষের ভিড় এমনিতেই শহরের যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থানে হামলে পড়ে। তার ওপর আবার আছে মেশিনগানের মতো 'মেলা'-গান। মানে মেশিনগানের ট্রিগার টিপলেই যেমন একসাথে গাদা গাদা গুলি ছুটে এসে লক্ষবস্তুকে ঝাঁঝরা করে দেয়, সেরকমই একটি 'মেলা'-গানের ট্রিগারও কে যেন টিপে দেয় এই মরশুমে। অলিতে গলিতে যেদিকে তাকাও সেদিকেই দেদার মেলা। বইমেলা, হস্তশিল্প মেলা, খাদ্য মেলা, বাদ্য মেলা... ইত্যাদি ইত্যাদি... কত কিছু।

কিন্তু দুপুর দুটোর পর থেকেই সূর্যাস্তের তোড়জোর শুরু হওয়া যে শীতকাল দেখে দেখে এ তাবৎকালের জীবন কাটল, এখন বুঝি সেটার মেয়াদ ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেছে। এটা ঠিকই যে নতুন বছরের শুরুতে মনেপ্রাণে নতুন হওয়ার ইচ্ছে আর আশাকে আজও ত্যাগ করা যায় না। কিন্তু তবু একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বুক থেকে বেরিয়ে আসে যখন ইউটিউব ভিডিওতে দেখি দ্য সিম্ফনি অফ মেল্টিং। উত্তর মেরুতে এক চাঁই ভাসমান ভরফের ওপর বসে গ্র্যান্ড পিয়ানো বাজাচ্ছেন এক শিল্পী। চারধারের বরফের প্রাচীরের মাঝে সেই বরফের ভেলা ভেসে চলেছে। এবং সেই যন্ত্র সংগীতের সুরে মিলেমিশে যাচ্ছে বরফের দেয়ালগুলোর ক্রমাগত টুকরো টুকরো হয়ে জলে ভেঙে পড়ার শব্দ। প্রতি বছরের শুরুতেই তাই এটা খেয়াল করতেই হয় যে, পৃথিবীর তাপ বাড়ছে চক্রবৃদ্ধি হারে। জানুয়ারি মাসে কোথায় সেই ঠান্ডা, যখন চানঘরে এক মগ জল ঢাললে মনে হবে গোটা শরীরটা চুরমার হয়ে ভেঙে গেল?

তার মানে, এটাই কি সত্য নয় যে টেকনোলজির ব্যাপারে আমাদের সভ্যতা অতুল বৈভবশালী হয়ে উঠলেও প্রকৃতির নিখাদ স্বাদ আহরণের বেলায় দিনে দিনে গরীব থেকে গরীবতর হয়ে পড়ছে? আকাশের একটি মাত্র সূর্য, একা হাতে এত নিখুঁত একটি ইকো সিস্টেম গড়ে তুলেছে লক্ষ লক্ষ বছরের ধৈর্য ও যত্নে। কিন্তু অলটারনেটিভ এনার্জি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে তা দেখে আদৌ কিছু শিক্ষা নিয়েছি কি আমরা? ঢিমে আঁচে রান্নার যে স্বাদ, মাইক্রোওয়েভ কুকিং কোনওদিনই তার সমতুল্য হতে পারে না। কিন্তু সে কথা তলিয়ে ভাবার প্রয়োজনীয়তা বোধহয় ফুরিয়ে যেতে বসেছে আমাদের জীবন থেকে! একটা আলোকোজ্জ্বল আইপিএল টুর্নামেন্টে অবাধে এনার্জি খরচ করতে আমাদের গায়েই লাগে না, কারণ তার কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ কোথাও কোনও মিডিয়াতে প্রকাশ পাবে না।

সুতরাং আমার জানুয়ারির সূর্য হয়ত আর কোনওদিন সেই সব প্রাচীন কুয়াশার আড়ালে অস্ত যাবে না। কুয়াশার বহু মাইল ব্যাপী আস্তরণের পেছন থেকে ছুঁড়ে দেওয়া তার রক্তিম রশ্মির অস্তরাগ-এর স্মৃতিটুকুই সার। তবুও, আজকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলার সময় যে আকাঙ্খা, প্রেরণা ও কল্পনা মনের গভীরে জেগে থাকে... সে সবের প্রেরণা সে। আমি, আমার আমি, রাঙা কুয়াশা, তোর জন্য...

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

শালবনে রক্তের দাগ

সত্যম যেন রাঘবকে না দেখে। সে কাজ করতে দেবে না রাঘব কে। আমি সত্যমের গাড়িতে দেখলাম ঘোমটা টানা মহিলা। সে কি নারী পাচারের সঙ্গে জড়িত? টাকা নেবে না নিখিল, বনের দেবতা রাগ করবেন। সত্যম ফিরল বেশ রাতে আর রুক্মিনি এলো উত্তাপ নিয়ে। আচ্ছা, আমি কি আমার বাড়িতেই চোরের মত ঘুরে বেড়াই? আমার মনে পড়ে সেই কাঠের তৈরি চব্বিশটা শো কেস। আমি অনুভব করি আমার চারপাশে একটা জাল। ধুসর ব্যাগটা খুলে পেলাম অনেক টাকা। তারপর? **সাগরিকা রায়ের** থ্রিলার।

১৬

লোভ এল খুব সন্তর্পনে পা ফেলে। আমি টাকার বান্ডিল শুদ্ধ ব্যাগটা নিয়ে ছুটে আমার পড়ার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সেই ধূসর রঙের ব্যাগ! ব্যাগটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলাম আমার বেশ মনে আছে। আমার বইয়ের আলমারিতে। সেখানে কাউকে হাত দিতে দিতাম না। নিজেই বই গুছিয়ে রাখা আমার শখ ছিল। সেটা এবারে কাজে লেগে গেল। একদিন বাবা আর মা কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়েছিল। দাদু নিজের ঘরে ঘুমিয়েছিল। আমি দরজা বন্ধ করে ব্যাগটা বের করে আনলাম। ব্যাগটার সঙ্গে সঙ্গে কানুও বেরিয়ে এল। ওর বুক বেয়ে রক্তের ধারা নেমে আসছিল। ভয় পেলাম ফের। কিন্তু সেই বয়সেই আমি কতটা স্ট্রং ছিলাম ভাবলে অবাক হয়ে যাই। নিজেকে সামলে নিয়ে টাকা গুনতে বসে গেলাম। সব একশো টাকার নোট। গোনা শেষ হল। আড়াই লক্ষ টাকা ছিল মোট। আমার জীবনের প্রথম ইনকাম। রাস্তা দেখিয়েছিল কানু মিস্ত্রি। পুলিশ ওকে অস্ত্রপাচারকারী বলে চিনতে পারেনি। সে সময় ডুয়ার্সের পুলিশ খুব একটা সক্রিয় ছিল না বলে এখন মনে হয়। কয়েকদিন একটু হইচই হল। কানু যে অপরাধী হতে পারে, সে কথা কেউ ভাবতে পারল না। একটা গল্প বুনে ফেলল লোকজন। নির্জন পথ দিয়ে কাজে যাচ্ছিল কানু। সে সময় টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয় ডাকাত। কানু বাধা দিতে গেলে গুলি করে। এসব হল হরিপুরের ক্রিমিনালদের কাজ। জানো না তো, হরিপুরে পুলিশ পর্যন্ত ঢুকতে ভয় পায়! আমি শুনে গেলাম। মুখ খুললাম না! পড়াশোনায় ভাল ছিলাম। বাবার মতো অধ্যাপনায় এলাম। কিন্তু সে দিনের কথা আজও কি ভুলতে পারি? পারি না! আজও কানু আসে পা টিপে টিপে। চোরের মতো চারপাশ দেখে ছোট ঘরে ঢুকে যায়। আর তখনই আমি বুঝে যাই ফের একটা অপারেশনে জড়াতে যাচ্ছি। কেন যে কানুকে মেরে ফেলা হল জানি না। কানু কি দর বাড়াচ্ছিল? ভয় দেখাচ্ছিল অস্ত্রপাচারকারীদের?

ঘুমিয়ে পড়তে হবে। কাল রাঘব আসবে। এখন জানতে হবে রাঘবের কথা সত্যমকে জানিয়ে দিয়েছে কিনা শ্যামল। সেটা করলে ভাল করবে না শ্যামল। আমি শ্যামলের দু' নম্বরি চাল পছন্দ করছি না। আমাকে বিরক্ত করো না শপিং মল।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। একটা শব্দ পেয়েছি ঘরের ভেতরে। কিসের শব্দ! চট করে উঠে বসলাম না। চোখ খুলে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছি। আবছা আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। সেই আলোতে মনে হল কেউ দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আবছা আলোটা আর ঘরে নেই। কী হল? কে এসেছিল ঘরে? দরজা বন্ধ করেই শুয়েছি বরাবরের মতো।

রুক্মিণী কি বাইরে গেল? ভোর চারটের সময়ে? আস্তে উঠে বসলাম। রুক্মিণী কাল রাতে সোফায় এলিয়ে পড়েছিল। এখন সেখানে ও নেই। এ ঘরেই নেই রুক্মিণী। বেশ, তুম কাঁহা গয়ে ম্যাডাম! দেখতে হ্যায়। বালিশেরর পাশ থেকে আমার ছোট্ট সোনাকে নিয়ে বের হলাম খুব সাবধানে। দরজা আস্তে খুলে উঁকি দিয়ে বাইরের দিকে দেখে নিলাম। কেউ নেই! না থাকাই স্বাভাবিক। চুপি চুপি বের হয়ে আমাকে দেখা দেওয়ার জন্য কি দাঁড়িয়ে থাকবে? কিন্তু কোথায় গেল এত তাড়াতাড়ি? শ্যামলের কাছে? না। তাহলে যা বলার ফোনেই বলতো। তাহলে একটি জায়গা বাকি থাকে। আমি সত্যমের বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজায় হাত দিয়ে চাপ দিতে বোঝা গেল ভেতর থেকে বন্ধ। কান পাতলাম। সত্যম কিছু বলছে। কাকে বলছে? ভেতরে রুক্মিণী আছে তো? নাকি অন্য কাউকে ফোন করছে সত্যম?

—ওহ, নটি! উমম! রুক্মিণীর গলা। রুক্মিণী এখানে চলে এসেছে! আর তাই বান ডেকেছে ঘরে। সত্যম ওর বাবা নয়! এই মিথ্যে দিয়ে কী করতে চেয়েছে সত্যম আর রুক্মিণী? এতদিন ধরে আমার চোখে ধুলো দিয়ে আসছে এরা? আমি অন্ধ নাকি? কিন্তু তিনটে ঘুমের ওষুধ খেয়ে রুক্মিণী এত ভোরে জেগে গেল কেমন করে? আশ্চর্য!

নিঃশব্দে চলে এলাম। দরজা যেভাবে রেখে গিয়েছে রুক্মিণী, সে ভাবেই রইল। বিছানায় শুয়ে পড়ার আগে চেক করে নিলাম সেবারের মতো পাইথন শুয়ে আছে কিনা! কে যে রেখেছিল পাইনথনটাকে আমার বিছানায়! শ্যামল লোক লাগিয়ে কাজটা করেনি এমন প্রমাণ আমার কাছে নেই! কেবল মনে হচ্ছে শ্যামল আছে এসবের মধ্যে। কিন্তু শ্যামলের পেছনে কে? ঘুম হবে না এখন। কাল সত্যম সিকিম থেকে কী মাল আনল জানা হল না! রাঘব আসছে আজ। রাঘবকে কাজ দিতে হবে। কিন্তু রাঘবের হাতে কাজ যে বেড়েই যাচ্ছে!

অন্ধকার ঘরে শুয়ে হাসি চাপতে পারলাম না! দুই আর দুই যোগ করতে জানি। মেয়েটা কে? কেনই বা শ্যামল ওকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না? পুরোটাই মিথ্যে? শ্যামল খেলাচ্ছে আমাকে? সাড়ে পাঁচটার সময়ে উঠে পড়লাম। বাইরে বেরিয়ে খোলা বাতাসে শ্বাস নিতে ভাল লাগছে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম চারপাশ ভেজা। মানে রাতে বৃষ্টি হয়েছে। মোবাইলের অ্যাপসে ই পেপার খুললাম। গতকালের নিউজ দেখা হয়নি। বাপরে! সাংঘাতিক খবর! ফরেস্ট থেকে গাছ পাচারের অভিযোগে কোনও এক ফরেস্ট বিটের ডেপুটি রেঞ্জারকে হাতেনাতে ধরেছে ভিজিল্যান্স সেল ও দুর্নীতিদমন শাখা।

খবরটা দেখে অস্থির লাগছে। ব্যালকনিতে বসে চারপাশের অঢেল সবুজের মধ্যে রক্তের টাটকা গন্ধ পাচ্ছি। মৃত্যু খুব কাছে দাঁড়িয়ে। আদেশের অপেক্ষা করছে মাত্র। অথচ চরপাশেই কি অপার্থিব দৃশ্য! হালকা মেঘ উড়ে যাচ্ছে আকাশে। গাছের চকচকে সবুজ পাতার ফাঁকে চারটে টিয়ে ওড়াওড়ি করছে। আমার পোষা খরগোশ তুরতুর করে লনে ঘুরে ঘুরে কচি দুব্বা ঘাস খাচ্ছে। এই সময় আমার নিখিলের কথা মনে হল। ও যদি খবর পায় গাছ পাচার করতে গিয়ে কেউ ধরা পড়েছে, তাহলে নিখিল মুখ না খুলে পারবে না! ফল অবধারিত মৃত্যু! কেমন করে বাঁচাবো নিখিলকে! ও যে বাঁচতে চায় না! এই ডুয়ার্সের বাতাসে, কালজানি নদীর জলে, চিলাপাতা ফরেস্টের গহীন অন্দরের ছোট্ট ঝোরার পাশে বসে থাকতে চায়! কী আর করতে পারি! থাকুক ও চা গাছ, ভুটান পাহাড়, ঘনান্ধকার বনভূমি, নরম শীতল রোদ হয়ে!

—গুড মর্নিং। তোমার বাড়িটা হোম স্টে বানিয়ে ফেল! সত্যম আসছে। হাতে মোবাইল ধরা এমনভাবে যেন কথা চলছিল। এই মাত্র শেষ হয়েছে।

—কেন? হোম স্টে বানাতে যাব কেন?

—দার্জিলিঙের টুরিস্টরা সব নেমে আসছে! সব ডুয়ার্স দেখতে আসছে! ভিড় লেগে যাবে এবারে এখানে দেখ!

—আচ্ছা? খবরটা জেনেও না জানার ভান করলাম। কেউ যখন নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করছে, তখন সুযোগ পেলে তাকে কথা বলার সুযোগ করে দাও। বেফাঁস কথা বেরিয়ে আসতে পারে।

জিসিএস-এর মেইন অফিস ভানুভবন পুলিশ কব্জা করেছে। গুরুং পালিয়ে আছে। বাস ছাড়াও সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছে মোর্চা। টুরিস্টরা ভয়ে অনেকেই নেমে ডুয়ার্সের দিকে ছুটি কাটাতে আসছে।

—ওহ্, তাহলে গুরুং এখন চায় কী? (সত্যম বা কী চাইছে?!)

—ঘিসিংয়ের আমলে বন্‌ধ, অবরোধ... এসব দিয়ে পাহাড় অচল রেখে ঘিসিংকে সরিয়ে দিয়েছিল, ওর বিরুদ্ধে যাওয়ায় মদন তামাংকে খুন করেছিল। এখনও সেভাবে এগোতে চায়। পাহাড় অশান্ত। বলে সোফায় গা এলিয়ে দিল সত্যম —আজ যাচ্ছি নেপাল। ঘুরে আসি। বিজনেসের কাজ আছে। ভাবছি বাংলাদেশে যাব নেপাল থেকে ফিরে। তোমার ড্রাইভারকে নিলে কি অসুবিধে হবে? দুটো দিন নেপালে থাকছি। অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

অবাক হলাম। এবারে সরাসরি শ্যামলের সঙ্গে যোগাযোগ করছে আমার সামনেই! দেখা যাক কী দাঁড়ায়।

—বেশ। কিন্তু দু'দিন কিন্তু। মনে রেখ।

আবার নতুন কোনও ধান্দায় ঢুকছে সত্যম। অথচ শ্যামল জানে আজ রাঘব আসছে! তাহলে ও পালাচ্ছে নিজেকে সেফ সাইডে রাখতে! সেটা হবে না শ্যামল। মুখে কিছু বললাম না। শ্যামলকে ডেকে জানতে চাইলাম ও নেপাল যাচ্ছে সেটা কি ও জানে? রাঘবের কাজটা তাহলে রাঘব একাই করে নিক?

শ্যামল ভয় পেয়েছিল প্রথমে। আমার গলার স্বাভাবিক স্বরে স্বচ্ছন্দ হল —হ্যাঁ স্যার, আমি দু'দিন পরেই চলে আসছি। তখন কি কাজটা করানো যাবে?

—না শ্যামল। ঝামেলা অনেক দূর যাওয়ার আগেই তার পথ কেটে দিতে হয়। তুমি আসার আগেই কাজ হয়ে যাবে। তুমি সেই মেয়েটার একটা খোঁজ এনে দিতে পারলে না আজও, এটাই খারাপ লাগে জানো তো?

—এবারে আমি সব ছানবিন করে মেয়েটার খোঁজ আনবো স্যার। দেখে নেবেন। শ্যামল পারলে আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে দেয়। এত ভক্তি কেন? অর্থাৎ আজ সত্যমের সঙ্গে যাওয়ায় ভাল রকম লাভ আছে। আমার মন বলছে ওরা সেই 'মাল' নিয়েই যাচ্ছে। আমার বাড়িতে মাল রেখে নিশ্চিন্তে থাকল, অথচ আমি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারলাম না! কিসের বুদ্ধির বড়াই করি? নাকের সামনে বুদ্ধি নিয়ে জাগলিং করে যাচ্ছে সত্যম। ওরা চলে গেল দু'দিনের নামে। রুক্মিণীও গেল। সত্যম বার বার দাঁত কেলিয়ে যাচ্ছে —তোমার কোথাও যাওয়ার থাকলে বল, শ্যামল থেকে যাবে।

আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। নিজে ড্রাইভ করতে ভালবাসি। একটা কাজ মন দিয়ে করে গেলাম। ওরা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এক পলকের জন্য ওদের নজরছাড়া করিনি। গাড়ির ভেতরটা দেখেছি। কায়দা করে গাড়ির সিট তুলিয়ে কিছু মাল ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আসলে রুক্মিণীর প্রচুর লাগেজ থাকে। কিছুই পেলাম না। কিন্তু মাল ব্যাপারটা বুঝলাম না। কী বলতে চেয়েছিল সত্যম? আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিল —মাল ওখানে আছে। আকাশে মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সত্যম কি আকাশে মাল লুকিয়ে রেখেছে? মাল মানে কি জহরত? হীরে মুক্তো? তাহলে রুক্মিণীর ব্যাগে থাকতে পারে। অথচ সত্যম আঙুল তুলে বলেছিল আকাশে আছে!

ওরা চলে গেল। আমি সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মন বলছে মাল বাড়ির বাইরে যায়নি। শ্যামলের ঘর সার্চ করি? আমার বাড়ির সামনে একটা শালগাছ আছে। ওই হয়ত শাল গাছের চিহ্ন হয়ে থাকবে। আর সব পাচার হয়ে যাচ্ছে। আজ হঠাৎ ওর দিকে

নজর পড়ল কেন কে জানে!

১৭

হিসেব ঠিক ঠাক মিলছে না। সত্যম, শ্যামল আর রুক্মিণী তিনজনেই চলে গেল নেপালে। অর্থাৎ এখানে নজরে রাখার মতো কিছু নেই। তেমন হলে রুক্মিণীকে রেখে যেত। যায়নি, বরং গুছিয়ে নিয়ে গেছে। ওর শ্যামলকেও খুব দরকার। কী এমন হতে পারে? নেপালে শুধু ঘুরতে যায়নি ওরা। রুক্মিণীর লাগেজটা দেখতে পারলে ভাল হত। একচুয়ালি সত্যম আমাকে দেখেছিল। আর তাই হেঁয়ালি করে আকাশ দেখিয়েছিল। প্রত্যেকদিন একটু করে চোখ খুলছে আমার। মাল বলতে যা বোঝায় সেটা ওদের সঙ্গে গেছে। শ্যামলের ঘরে যাব। ওখানে একটা কিছু সূত্র পেতে পারি।

ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে শ্যামলের ঘর খুলে ফেললাম। খাট, বিছানা, আলমারি, ছোট টেবিল, দুটো চেয়ার। দুটো এঁটো চায়ের কাপ... জলের বোতল... বিছানার ওপর ছেড়ে রাখা গোল গলা টি, বারমুডা... এক জোড়া রুম স্লিপার... ব্যাস! বিছানা উলটে পালটে কিছু পেলাম না বলার মতো। এখন কি সত্যমের ঘরে যাব? সিঁড়ি ভেঙে সত্যমের ঘরের চাবি খুলে ফেললাম। ঘরটা অন্ধকার। কিছু পাব না জানি। সত্যম এত বোকা নয় যে তথ্য প্রমাণ রেখে যাবে। কী হতে পারে? ওরা কোন মাল পাচার করছে সেটা ঠিক। কিন্তু... কিন্তু সেই মাল কীভাবে পাচার করছে? আমি নিশ্চিত ওদের কাছেই আছে মাল! চিন্তায় আচ্ছন্ন থেকে বসে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। কোথা থেকে নূপুর বাজিয়ে ক্যাপ্রি পরা রুক্মিণী হাসতে হাসতে আসছে —দেখ, দুটো সোনামন পাখি পেয়েছি। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল ও। আর তখনই তন্দ্রা ছুটে গেল। কোথায় রুক্মিণী! তন্দ্রার মধ্যে পাখি দেখাতে আসছিল। আচ্ছা! সত্যম কী বলেছিল সিকিম থেকে ঘুরে এসে? দুটো ক্যানারি পাখি দিয়ে এলাম তামাংকে। রুক্মিণী ওদের নাম রেখেছে সোনামন। সোনামন! খিচ খিচ করছে। ওরা নেপালে সোনা পাচার করছে কি? দুটো মহিলাকে নিয়ে গিয়েছিল! একসাথে দুটো কাজ করে এসেছে! সিওর! এখন একটাই উপায়। মোবাইলের সিম চেঞ্জ করে নিলাম। একটা ফোন করতে হবে।

সত্যমের ফোন যখন এল, আমি তখন খরগোশটাকে গাজর খাওয়াচ্ছি। ফোন রিসিভ করতে একটু দেরি হয়ে গেল। পাঁচ মিনিট মাত্র দেরি। দশটা মিস্‌ড কল! সত্যমের আমাকে আবার দরকার পড়ল কেন! ওর সঙ্গে তো শ্যামল আছে। রুক্মিণী আছে। কী হল?

ফোন ধরতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সত্যম —সুভদ্র, খুব বিপদে পড়েছি। আরে দেখ, আমাদের গাড়ি আটকেছে পুলিশ!

—সে কি? কেন? আমি হতবাক প্রায় —ছম্মক ছল্লো কেউ ছিল নাকি? কাউকে পাচার করছিলে? তোমার যা সব কান্ড!

—আরে না না! আমরা তিনজনেই আছি। খুব ঝামেলা করছে এখানে! কী করব বল দেখি!

—আমি কী বলব! আমাকে ওদিকে কেউ তো চেনে না! তাছাড়া ভয় পাওয়ার মতো কিছু না থাকলে ভয় পাচ্ছ কেন?

সত্যম ফোন কেটে দিল। এবারে কান্না থরো থরো গলায় রুকুমণি ফোন করবে! হুম্, ঠিক ধরেছি। ফোন রিসিভ করে আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম —কী হচ্ছে রুকু? কে আটকেছে তোমাদের?

ওহ্ ডার্লিং! আমাকে ওদের গাড়িতে তুলে নিচ্ছে।

—কিচ্ছু ভয় নেই। তোমরা কোথায় আছ এখন?

রুটটা জেনে নিলাম। অফিসারের সঙ্গেও কথা বলে নিলাম। আমি যাচ্ছি। ওদের কোন থানায় নেওয়া হচ্ছে জেনে সেখানেই যাচ্ছি।

খরগোশটার খাওয়া হয়নি। আস্তে সুস্তে ওকে খাওয়ালাম। কফি নিলাম এক মাগ। ওদের তল্লাশি চলছে। বের হোক মাল। ততক্ষণ ভেবে নিই। এমন যদি হয় ওরা এই বাড়িতে এমন কিছু লুকিয়ে রেখে গেছে! হয় হাতির দাঁত। গন্ডারের শিং, বাঘের চামড়া ইত্যাদি ইত্যাদি! পরে সেগুলোর জন্য আমাকেই অভিযুক্ত করল সত্যম! আমি সমস্ত বাড়ি চিরুনি তল্লাশি করেও এমন কিছু পাইনি। অথচ কেন মন হয়ে আছে আছে! কানু মিস্ত্রির মতো এই বাড়িতে লুকিয়ে রাখার নিয়ম এরাও রক্ষা করে চলেছে! লনে পায়চারি করছি। বাড়ির পেছনে চমৎকার পুকুর আছে। তেলাপিয়া ছেড়েছি। বর্ষার জল পেয়ে পুকুর টইটুম্বুর। মাঝ পুকুরে জলে বুদবুদ উঠছে মানে হল কোনও মাছ ওখানে ঘুরছে। আমার নজর শ্যামলের ঘরের দিকে। শ্যামল প্রচুর টাকা রোজগার করে বলে আমি অনুভব করি। আমার হয়ে অনেক কাজ করে দেয় বলে আমি বিশেষ নাক গলাইনি ওর বিষয়ে এতকাল। কিন্তু এবারে একটু নাক না গলিয়ে নিজেকে বিপদে ফেলতে পারি না। ধরা যাক শ্যামলের ঘরে কিছু রাখেনি। তাহলে আমি হলে কী করতাম? ঘরে কেউ চোরাই মাল রাখে না। কানু অন্যের বাড়িতে রেখেছিল। আমি অন্যের বাড়িতে রাখার সুযোগ পাচ্ছি না মানে আমাকে নিজের বাড়িতে রাখতে হবে। বাগানে ঝোপঝাড়ের আড়ালে? বড় বড় গাছের ওপর? কিন্তু সেখানে রাখতে হবেল সবার চোখের সামনে থেকে করতে হবে! তাছাড়া শ্যামল গাছ বাইতে পারে না। অগত্যা চোখের সামনে বলতে... কোথায়...! পুকুরের জল হির হির করে কাঁপছে। বাড়ির পুকুর। এখানে কেউ স্নান করে না! মাঝে মাঝে শ্যামলকে দেখেছি গরম সহ্য করতে না পেরে সন্ধের দিকে পুকুরে স্নান করে এসেছে। পুকুর! শ্যামল! দুজনের ভারি ভাব দেখতে পাচ্ছি! বাড়ির পেছনে শ্যামলের ঘর, তার পাশেই ছোট্ট পুকুর। এখানে শ্যামল আর কয়েকটা তেলাপিয়া ছাড়া কেউ কারও খবর রাখে না! এমন জায়গা আর কে আছে? আমি জলে নেমে পড়লাম। কিন্তু বুঝতে পারছি আমার একার দ্বারা সম্ভব নয়। কাকে ডাকবো হেল্প করতে? নিখিল!

নিখিল ভারি অবাক হল। জলে নেমে একটা কিছু খোঁজ করতে হবে। একটা কিছু মানে? নিখিলের প্রশ্নের যথার্থ জবাব আমিও জানি না। হতে পারে কোনও প্লাস্টিকের বস্তা মানে বড় প্যাকেট! হতে পারে! ...মোট কথা প্ল্যাস্টিক ছাড়া অন্য আবরণে কিছু জলে রাখা যাবে না। শুনে অতি উৎসাহে নিখিল দ্রুত জলে নেমে তোলপাড় করে তুলল পুকুর। বড় মাছের মতো ঘাই মেরে মেরে উঠছে মাঝে মাঝে। এক সময় আমি হতাশ হয়ে পড়তেই নিখিল জলের ভেতর থেকে মাথা তুলে তাকল —উফফ। আছে স্যার। বড় বড় সাত-আটটা নাইলনের বস্তা। দড়ি জলের বাইরে গেছে দেখেন। কোনও গাছের সঙ্গে বান্দা আছে।

পুকুরের পেছন দিকটায় জঙ্গল। আমি ঘুরে সেদিকে গেলাম। খুঁজতেই একটা সরু মাটি রঙের দড়ির অস্তিত্ব পাওয়া গেল যেটা জঙ্গলের ভেতরে চলে গেছে। একটা জারুল গাছের গোড়া ঘিরে পোক্ত করে বাঁধা আছে।

অবশেষে একটা একটা করে বস্তা তুলতে হল টেনে। নিখিল বার বার প্রশ্ন করে যাচ্ছে —এতে কী আছে?

আমি 'পরে বলছি' বলে কাজটা করে রাখছি। যে কোনও সময় সত্যম বা শ্যামল, রুক্মিণী চলে আসতে পারে। ঘর্মাক্ত এবং জলে সিক্ত একসাথে চলে কিনা জানা ছিল না। আজ দেখলাম বেশ চলে। এবার এগুলো নিয়ে কী করব?

হুম, বেডরুমে ঢুকিয়ে দিলাম নিখিলের হেল্প নিয়ে। এখানে গোপন ঘর আছে আমার। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না ওখানে ঘর আছে। আমার কি নিজস্বতা বলে কিছু নেই নাকি? নিখিলকে চা বানাতে বলে গোপন দেওয়াল সরিয়ে একট করে বস্তা টেনে টেনে ঢুকিয়ে নিলাম। বস্তাগুলো ভারি। এ গুলোতে কী থাকতে পারে সেটা নিয়ে একটা আন্দাজ করেছি, কিন্তু নিখিলের সামনে মুখ খুলিনি। ছেলেটো এসব কান্ড দেখে ভড়কে আছে। মুশকিল হল এই ধাঁচের ছেলেদের নিয়ে। এরা পেট পাতলা আর ভারি ভগবানে আত্মসমর্পিত। একে

খানিকক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে পারলেই সমস্যা নেই! আমার গোপন কক্ষ অদৃশ্য করে দিলাম। নিখিল চা নিয়ে এল। চা খেতে খেতে ভাবলাম সত্যম ডেকেছে। কিন্তু আমি এত তাড়াহুড়ো করে যাব কী করে? আমাকে যেতে হবে ঠিকই। একটু ওয়েট কর সত্যমজি! হা হা হা। কী আছে একবার দেখে নিই ওই বড় বড় প্যাকেটে! তুমি শালা এমন কায়দা করেছ ধরা পড়ে গেলে আমি ঝামেলায় পড়ে যাব! কিন্তু এতে আছে কী? দেখতে হচ্ছে।

১৮

বার বার ফোন করছে রুক্মিণী আর সত্যম। আমি বলেছি গাড়ি মাঝ রাস্তায় এসে টায়ার বিগরিয়ে বসেছে। ঠিক হয়ে গেলেই আসছি। তখন আমি ঘরের গোপন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকছি। মেঝেতে রাখা আছে ছয়টি প্লাস্টিকের বস্তা। একটি করে বস্তা খুলছি। প্রথমে বের হল সাব মেসিনগান দশটি। পরপর বের হচ্ছে ম্যাগাজিন পঁচিশটি, গ্রেনেড পঞ্চাশটি, চারটি পিস্তল, এ কে ফরটি সেভেন সাতটা, স্নাইপার, কারবাইন! এত অস্ত্র পাচার করছিল সত্যম আর শ্যামল! সঙ্গে রুক্মিণীও আছে। আমি সত্যমের এতটা ধূর্ততায় বিশ্বাসী ছিলাম না। ও সাঙ্ঘাতিক লোক জানি, কিন্তু আমাকে লুকিয়ে আমারই বাড়িতে এভাবে অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলা? অসুবিধে হল নিখিল জেনে গেল পুকুর থেকে প্লাস্টিকের বড় বস্তা তোলা হয়েছে। যে কোনওভাবে হোক, সত্যমের কানে কথাটা যাবেই। আপাতত নিখিলকে সামলাতে হবে।

চায়ের এঁটো কাপ নিতে এসেছিল নিখিল। ওর হাতে কাপ ফেরত দিয়ে ঝট করে শ্যামলের ঘরের ছবিটা চোখের সামনে দেখে ফেললাম। টেবিলের ওপর দুটো এঁটো কাপ ছিল। মানে শ্যামল একা নয়, ওর সঙ্গে কেউ ছিল। দু'জনে বসে চা খেয়েছে! কে ছিল শ্যামলের সঙ্গে! সত্যম? নাকি অস্ত্রপাচারকারীদের কেউ?

ফোন বাজছে। রাঘব!

—তুমি চলে এসেছ?

—হ্যাঁ। দেখা করতে হবে। কোথায়?

—তুমি আছ কোথায়?

—হাতিপোঁতায়।

বেশ। রাঘব দেখা করতে চায়। শ্যামল এখন সামনে না থাকাই ভাল। আমি চাই না শ্যামল রাঘবের ব্যাপারটা জানতে পারুক। ওকে লুকিয়ে কাজ করতে হবে। রাঘবের এখানে আসার কথা তো শ্যামলকে বলা হয়নি। তাছাড়া শ্যামল এখন কেস খাচ্ছে। সোনা পাচারের অভিযোগে পুলিশের হেফাজতে আছে। কাল চলে যাবে ডি আর আই-এর হেফাজতে। বিকেলের দিকে রাঘবের সঙ্গে দেখা করে নেব। এখন সত্যমের সঙ্গে দেখা করে আসি। না হলে কেস গুবলেট হয়ে যাবে। সত্যম আমাকে সন্দেহ করতে পারে, এমন সুযোগ আমি দিতে পারি না।

রাঘবের সঙ্গে সময় ফিক্সড করে নিলাম। ফোন রেখে নিখিলকে বাইরে কোথাও যেতে বারণ করে, কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বারণ করে বেরিয়ে এলাম থানার উদ্দেশে। নিজে ড্রাইভ করছি। ফোনে রাঘবকে ধরলাম। কিছু প্ল্যান ছকে নিলাম। কোনও কনফিউশন থাকা উচিত নয়।

থানায় পৌঁছতেই দেখি মুখ শুকিয়ে থাকার কথা যাদের, তারা হাসি মুখে গল্প করছে। শ্যামল খানিক দূরে বসে গেম খেলছে মোবাইলে। আমি যাওয়ার পরে ওরা উঠে দাঁড়াল। হতভম্ব আমি সত্যমের মুখের দিকে তাকালাম। আসলে ওর চোখ দেখতে চাইছিলাম। সত্যম হতাশাজনক ইঙ্গিত করল। অর্থাৎ খুব খারাপ অবস্থা। ধরা ভাল করেই পড়েছে। একেবারে হাতে নাতে।

—কী করে হল এটা? তোমরা সোনা নিয়ে যাচ্ছিলে? আরে, বিশ্বাস করে একবার বলে দেখতে। এভাবে কি কেউ সোনা পাচার করে? একটা বুদ্ধি দিতে পারতাম হয়ত।

সত্যম বলল— ওদের শরীর থেকে যে সোনা পাওয়া গেছে তার ভিডিও টেপ হয়েছে। এখন পুরো ব্যাপারটা হাতে নিতে হবে! আচ্ছা এখানে তোমার পরিচিত কেউ নেই? আমাদের হেল্প করতে পারে এমন?

বুঝলাম সত্যম সরাসরি ঘুষ দেওয়ার কথা বলছে।

—না, এখানে কাউকে আমি চিনি না। চেনাশোনা থাকলে কি রুক্মিণীকে এখানে বসে থাকতে দিতাম? ওরা রুক্মিণীকে ধরে রেখেছে কেন?

—ওর আর শ্যামলের শরীরে মোটা টেপ দিয়ে সোনা আটকে রাখা ছিল। রুকের রাকস্যাকে ছিল। আমার তো ছিলই। ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু ঝামেলা বাড়ল।

—টোটাল সোনার দাম কত হতে পারে?

—তিন।

অফিসার ভাল করে কথাই বলতে চায় না। কেস ঠুকে দেবে সাংঘাতিক। আমার আর করার কী আছে? কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। হায়ার লেভেলে কথা বলছি। দেখি কী করা যায়।

রুক্মিণী আমার হাত ধরে হেসে বলল— ডোন্ট ওয়ারি। ঠিক বেরিয়ে আসব। বাট পাশে থেক।

—হায়ার লেভেলে যাচ্ছি। তখন তুমি একটু...। হাসলাম। যার কাছে যাচ্ছি, তার নারীর টান আছে জানি। রুক্মিণী সেখানে দামি অস্ত্র। ও ভাল কাজ করতে পারবে।

হাসিমুখেই বিদায় নিলাম। সত্যম খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। আমাকে সন্দেহ করলে আমাকেই ফাঁসাবে ও। ওকে চিনি ভাল করেই। আজকের চেনা তো নয়!

ওদের বিশ্বাস অর্জন করা দরকার ছিল। সেটার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি। এদিকে অন্য চিন্তা আসছে মাথায়। সত্যম বা রুকু ম্যাডাম বা শ্যামলকে পুকুর রহস্য বলে দেবে নিখিল। কিন্তু কী করে আটকাবো নিখিলকে? হবে না। পারবে না নিখিল নিজেকে সামলাতে। আমাকেই দেখতে হচ্ছে। নিখিল, মুখ বন্ধ রাখার নিয়ম শেখাই হল না তোমার। আমি কে? কেউ না। কী আর করতে পারি!

ফিরে এলাম বাড়িতে। নিখিলকে বরং ছুটি দিই। ও গিয়ে ঘুরে আসুক কোথাও। কোথায় যাবে? ওর প্রিয় জঙ্গলে যাক। জঙ্গল দেখুক। বৃষ্টি ভেজা বন দেখুক ছেলেটা।

নিখিল হঠাৎ ছুটি পেয়ে খুব খুশি। চটপট এক ফ্লাস্ক চা বানিয়ে রেখে দিল টেবিলে। আমার খাবার হটপটে গুছিয়ে রাখল।

—কোথায় যাচ্ছ? নিখিল সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছিল। আমার পিছুডাক শুনে ফিরে তাকাল। সরু সরু চোখে হাসি ঝরিয়ে বলল— দেখি, রায়ডাকের দিতে যেতে পারি। শামুকতলায় যাব। সন্ধেবেলায় ফিরে আসব। চলে গেল নিখিল।

আজ আকাশ পরিষ্কার। যদিও হাওয়া-মানুষ বলেছেন বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। বাড়িতে বসে ভাল লাগছে না। একটা ফোন সেরে স্নান করে নিলাম। পোশাক পরছি, অমনি ফোন। রাঘব এত ঘন ঘন ফোন করছে কেন! নির্বোধ। একবারে কথা ঢোকে না মাথায়!

গাড়ি নিয়ে বের হলাম। হায়ার লেভেলের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে হবে। টোপ ফেলতে হবে। ভাল টোপ না হলে মাছ ফসকে পালাবে।

ড্রাইভ করতে করতে লো ভলিউমে রবিশংকরের সেতার শুনছি। গাড়ি ক্রমে রাস্তায় বাঁক নিল। ঘন সবুজ রাস্তায় যেতে যেতে মন প্রফুল্ল হয়ে যাচ্ছে। একটা দুশ্চিন্তা খুটখুট করছে না, সেটা বলতে পারব না। কিন্তু হালকা হালকা হাওয়া এসে আরাম কাকে বলে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। এসি অফ করে রেখেছি। খোলা জানালা দিয়ে মিঠে বাতাস এসে চুল ঘেঁটে দিচ্ছিল। গাড়ির স্পিড বাড়ালাম।

আরেকটা বাঁক নিলাম। রাস্তা নির্জন। দু'পাশে ঘন সবুজ আরও ঘন, আরও সবুজ হয়ে উঠেছে। শাল সেগুনের পাতা জমে থাকা বৃষ্টির জল পড়ছে টুপুস টুপ টুপ! খানিকটা এগিয়ে যেতেই দেখি দু'জন লোক, মুখে কালো কাপড় বাঁধা, এই মাত্র কোন কাজ সেরে দম নিচ্ছে যেন। আমার গাড়ি দেখে মুখ ঘুরিয়ে একটা শালগাছের পেছনে গিয়ে ফিরে দাঁড়াল —তাড়াতাড়ি চলে যান।

একদম দাঁড়াবেন না।

দেখি এই মাত্র একটা হত্যাকান্ড হয়ে গেছে। জবাই করা হয়েছে একটা মানুষকে। রাস্তার একদিকে মানুষটার মাথা গড়াগড়ি খাচ্ছে। দেহটা ধড়ফড় করছে তখনও। রক্তে জবজবে ভেজা রাস্তা। গড়িয়ে নাবাল দিকে চলে যাচ্ছে রক্তের ধারা! আমি থামলাম না। রক্তের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেলাম। গাড়ির টায়ারে রক্ত লেগে গেল! কিছু দূর পর্যন্ত চাকা রক্তের ছাপ ফেলতে ফেলতে যাবে। একসময় শুকিয়ে যাবে। আর ছাপ পড়বে না।

চারপাশ তখন বর্ষার জল পেয়ে তরতরে সবুজ। লাল নীল হলুদ বুনো ফুল ফুটে আছে।

১৯

বাড়িতে ফিরে অনেকক্ষণ ধরে শাওয়ারের নিচে রইলাম। শাল গাছের গা বেয়ে বৃষ্টির জল নেমে আসছিল। আরামের স্রোত ঝরঝরে করে তুলছিল। রায়ডাক থেকে ফিরেছি। সত্যমকে এবারের মতো বাঁচিয়ে দিতে যাতে পারি, সেই ব্যবস্থা করেই এসেছি। এখন রুক্মিণীকে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাতের একটা সুযোগ করে দিতে পারলেই কাজ শেষ।

স্নান আমার কাছে পরম বিলাসিতা। স্নান সেরে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে নিখিলের তৈরি করে রেখে যাওয়া চা ফ্লাস্ক থেকে কাপে ঢেলে নিলাম। আঃ! নিখিল চা-টা বানায় ভাল। বেচারা ছেলেটা। এতক্ষণে চা বাগানের ভেতরের পুরনো কবর খুঁড়ে ওর টুকরো করা বডিটা ঢুকিয়ে দিয়েছে রাঘব। কাজটা ঠিকঠাক করেছে কিনা দেখতে গিয়েছিলাম। না হলে ওই রুটটা এড়িয়ে যেতে পারতাম। রাঘব আর ওর সঙ্গী ভাল কাজ করেছে! নিখিল বড় বেশি জেনে ফেলেছিল। কাঠ মাফিয়াদের পেছনে লেগে পড়েছিল। জানে না, কান টানলে মাথা আসে! আত্মরক্ষা করা কি অনুচিত হয়েছে আমার? এরপর এতগুলো অস্ত্র! বেফালতু পেয়ে যাওয়া কিছু দামি অস্ত্র আমি হাতছাড়া হতে দেব? কিন্তু ওই নিখিল! ও সত্যমের কানে পৌঁছে দিত শ্যামলের মারফত। পুকুর থেকে অস্ত্র পাওয়ার খবর পেয়ে যেত সত্যম! সেটা অনভিপ্রেত। অনেকগুলো টাকা সত্যমের হাত থেকে ছিনিয়ে নেব না? কতদিন আগের কথা। আজও এমন স্টেজে এসে কানু মিস্ত্রির অস্ত্র বিক্রির টাকার গন্ধ নাকে ভেসে আসে। সেই ধূসর রঙের ব্যাগটা!

পাশে এসে কেউ দাঁড়াল। খুব কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। এই রকমই হয়। ঠিক এই সময়, একটা ঘটনার পর কানু এসে পাশে দাঁড়ায়। রাস্তাটা কানুই দেখিয়েছিল। সেটা আমি ভুলিনি। আশ্চর্য! কানুও ভোলে না। একটা অপারেশন, আর কানুর পাশে এসে দাঁড়ানো। চলছেই...!

আজ যাব আষাঢ় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দেখতে। নদীর বুকে নৌকায় শুয়ে শুয়ে চাঁদের আলোয় ভিজব। জল আর জ্যোৎস্না মিলে মিশে অপার্থিব চেহারা নেবে। সারারাত জলে থেকে ভোরের আকাশ দেখে বাড়ি ফিরব।

হটপটে আমার জন্য খাবার রেখে গেছে নিখিল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল! গেত তো গেলই! খিদে পাচ্ছিল। প্লেটে খাবার বেড়ে নিলাম। ফোনে ফোনে সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। জ্যোৎস্নার কাছে যাওয়ার আগে একবার থানায় যাই। রুক্মিণীকে ওপরওলার হাতে তুলে দিয়ে আসি!

ক্ষমতা মানুষকে অনেক কিছু দিতে জানে। স্মুথলি রুক্মিণীকে নিয়ে বাড়িতে এসেছি। ও ফ্রেস হয়ে নিচ্ছে। গ্ল্যামারাস লুক চাই। রুক্মিণী জানে কোথায় কী করতে হয়। ও যথারীতি তৈরি হয়ে এসেছে। স্কিনি টাইট পোশাকে রুক্মিণী অসাধারণ! অন্য সময় হলে এই খাদ্য আমার প্লেটে থাকতে! গাঢ় লিপ উত্তেজক হাসি হাসল —চল ডিয়ার। হরিণ মেরে আসি। হা হা হা শব্দে পুরুষালি হাসি হাসল রুক্মিণী।

কে যে কার হরিণ! যাহোক, গাড়ি করে রুকুকে পৌঁছে দিয়ে এলাম। যেখানে যাওয়ার ছিল রুক্মিণী সেখানে মন ভোলাতে গেল। সাড়ে তিন কোটির সোনা পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। উদ্ধার পাওয়া সহজ ছিল না। কিছু ছাড়তে হবে সত্যম। যে কোনও দিন আমি সেই চাওয়া চেয়ে নেব রানি কৈকেয়ীর মতো। নিজেদের ছাড়াতে চেয়ে ওপরওলাকে জড়িয়ে ধরেছে পাইথন পাকে পাকে। একবার এই নির্মম নিঃশ্বাস যদি গায়ে লাগে, বুকের রক্ত শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না। তখন কে ওপরওলা, কে তুমি! রুক্মিণী পাইথন। আমি ভাল করে জানি। সত্যম ওকে কতদিন কাছে রাখবে কে জানে। মালটাকে বেচলে ভাল দাম পাবে। তৈরি ঝক্কাস মাল।

এবারে আমি ফ্রি। চাঁদ দেখতে যাব। গাড়ি ড্রাইভ করতে গিয়ে নানা কথা মনে আসে। চাকায় শব্দ হচ্ছে কেন! ওহ্, চাকা ধুয়ে নেওয়া দরকার ছিল। পরিষ্কার না থাকলে এমন শব্দ হয়। রক্ত লেগেছিল কিনা! নিখিল থাকলে ধুয়ে দিত। বলতে হত না। নিখিল চাকা ধুয়ে দিচ্ছে— দৃশ্যটা ভাবতেই হাসি উথলে উঠল। নিখিল চাকা ধুয়ে দিচ্ছে হা হা হা! নিখিল চাকা... হা হা হা। হাসি থামিয়ে ভাবছিলাম। শ্যামলের কথা। নিখিলের ব্যাপারটা পুরো অস্বীকার করতে হবে। বলতে হবে নিখিলকে আমি অন্য কাজে পাঠিয়েছি কলকাতায়। রাঘব এখানে এসেছিল, সেটা জানানো যাবে না। নিজের বধের অস্ত্র শ্যামলের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সাবধান সাধু সাবধান। আর নিখিলের কাজ করবে, আমার আলিপুরের বাড়ি পাহারা দেবে এমন একটা লোক পাওয়া গেলে খুব ভাল হয়। আচ্ছা, নিখিলের একটা দিদি আছে না? গোলগাল মাটির গন্ধমাখা চেহারা? আহা, সেন্ট, পারফিউম মাখা মেয়েছেলে ঘেঁটে ঘেঁটে মনে চড়া পড়ে গেছে। নতুন জল চাই আমার। নতুন জলে নৌকা বাইতে কী ভাল লাগে! তাছাড়া নিখিল নেই, ওদের ইনকাম কমে গেল। সেটা ভাবতে হবে! আমি অকৃতজ্ঞ নই।

রাত পার হলে বোঝা যাবে রুক্মিণী কতটা খেলতে পেরেছে। সেই অনুযায়ী ওদের ফিরে আসা বা না আসার সবটুকু নির্ভর করছে। শ্যামল ছাড় পাবে কিনা ভাবার বিষয়। ইচ্ছে করলে ওকে ফাঁসিয়ে দেওয়াই যায়। ওর ঘাড়ে দোষের মাল চাপিয়ে দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কিন্তু দেব না। শ্যামলকে বাঁচাতে হবে। ও অনেক কিছু জানে। দু' নম্বর হল, শ্যামল উচ্চাকাঙ্খী বলে অনেকটা নির্মম। সাধারণ আবেগ, বিবেক ওর কাছে তুচ্ছ। সেই রকম তুচ্ছ হল যদি একবার বুঝে ফেলে ওকেই ফাঁসিয়ে নিজেরা ছাড় পেয়ে যাচ্ছে, তাহলে ও পারে না এমন কিছু নেই। সুতরাং শ্যামল বেঁচে যাচ্ছে। আর আমিই যে বাঁচিয়ে দিচ্ছি, সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব।

নাঃ, এখন রাঘবের একটা খোঁজ নেওয়া চাই। রাঘব...রাঘব...রাঘব... ফোন করতে হবে। সিম চেঞ্জ করে নিই। এই নম্বর দেখলে রাঘবও নিজের ফোনে সিম চেঞ্জ করে নেবে। আর এই নম্বরটা ডিলিট করে দেবে।

ইয়াহু। কাজ কমপ্লিট স্যার। রাঘবের গলা ভেসে এল।

—তোমার অ্যাকাউন্টে পেমেন্টে চলে গেছে। সাড়ে আটটায় ট্রেন। রওনা হয়ে যাও। অযথা কথা বলবে না কারও সঙ্গে। পরে কথা হবে। ফোন অফ করে গুছিয়ে নিলাম। এখন বেরিয়ে আসি নদীতে। রাতভোর করে ফিরে আসা হবে না, আগেই ফিরতে হবে। পরিচিত একজনের বিয়ে। বিয়ে করতে আসছে রাতে। সঙ্গে লোকজন থাকবে। বরকর্তা আসবে দেখা করতে আমার সঙ্গে। আসবে, ভাল কথা। দূর থেকে বিয়ে করতে আসছে বর। সঙ্গে বরযাত্রী। তিনটে গাড়ির দুটোতে মহিলারা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে থাকবে। আমার নিমন্ত্রণ আছে। আমি বাইরে খাই না। কিন্তু দেখা করতে হবে। সন্ধের মুখে ফিরব বাড়িতে। বাড়িতে কেউ নেই এখন। গেটে একটা পাহারা রেখে এসেছি। ওরা এসে উঠবে মাড়োয়ারি ধর্মশালায়।

(ক্রমশ)

স্কেচ: দেবরাজ কর

তিস্তাপাড়, পরিযায়ী পাখি ও নলেন গুড়ের ঘ্রাণ

উত্তুরে হাওয়ায় লেগেছে শীতের নাচন। থিরথির করে কেঁপে ওঠা আমলকির পাতা জানান দিচ্ছে জানুয়ারি মাস চলে এল। দেওয়ালে ঝোলানো পুরনো ক্যালেন্ডার সরিয়ে এবার নতুন ক্যালেন্ডার টাঙাবার পালা। প্রতি বছর শীতের শুরু থেকেই তিস্তার প্রাকৃতিক পাখিরালয়ে দলে দলে হাজির পরিযায়ী পাখিরা। পরিযায়ী পাখিদের ভিড় শীতের সময় উত্তরের একাধিক জলাশয়ের অন্যতম আকর্ষণ। এত দিনে সকলেই জেনে গিয়েছে যে, গাজলডোবাতে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে রংবেরঙের পাখিদের ওড়াওড়ি দেখতে ভিড় হয় দিনভর। আমরা, যারা সেভাবে পাখি চিনি না, আমাদের চোখকেও বর্ণময় মাইগ্রেটারি বার্ড তুমুল দৃষ্টিসুখ দেয়। তাদের চাক্ষুষ করতে সদলবলে সেদিন ঘুরে আসা হল তিস্তাপাড় থেকে।

তখন শীতের বিকেল গড়িয়ে গিয়েছে অনেকটাই। গোধূলির আলো পড়ছিল রূপসী তিস্তার গায়ে। আলো ঝিলমিল তিস্তার সে এক অনন্য রূপ। খালি চোখেই দেখা গেল নর্দান ল্যাপউইং, রুডি শেল ডাক আর ব্ল্যাক হেডেড গাল মনের সুখে উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশ বেয়ে। তাদের গায়ে এসে লাগছে দিকচক্রবালের ওপারে চলা অস্তগামী সূর্যের ছটা। তৈরি হচ্ছে এক অপার দৃশ্যসুষমা।

এবার এই তল্লাটে দেখলাম ছবি শিকারিদের ভিড় আরও বেশি। নদীতে নৌকা ভাসিয়ে জনমানবহীন পাখিরালয়ে হানা দিচ্ছেন অনেকে। খালবিলেও ক্যামেরা তাক করে ছুটছেন শখের ফোটোগ্রাফাররা। সেই সব পরিযায়ী পাখিদের যদি লেন্সবন্দি করা যায় এই আশায়। কিন্তু ছবি তোলার নামে পাখিদের বিরক্ত করা হচ্ছে না তো? সেটা যাতে না হয় সেটা দেখতে শুনলাম পর্যটন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সম্রাট চক্রবর্তী নিজেও অনেক সময় সরেজমিনে হাজির হচ্ছেন এই তল্লাটে। কেননা গাজলডোবার ব্যারেজ হোক, তিস্তার ফুলবাড়ির খাল হোক কিংবা রসিকবিল, এই ট্রেন্ড প্রায় সব জায়গাতেই।

মানুষের ঘুমন্ত পাখিপ্রেম যে হঠাৎ করে ভিসুভিয়াসের মতো জেগে উঠেছে সেটা স্বাস্থ্যকর। তবে সমস্যা হল চোরাশিকারিদের সক্রিয়তা নিয়ে। কারণ অতীতে দেখা গিয়েছে পাখি দেখার নাম করে ফাঁদ পেতে শিকার করা হয়েছে। কোথাও অত্যুৎসাহী পর্যটকদের দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হয়ে পাখিরা সরে গিয়েছে অন্যত্র। পরিযায়ী হাঁসের মাংস লুকিয়ে বিক্রির অভিযোগও কম ওঠেনি। হিমালয়ান নেচার অ্যাডভেঞ্চার বা ন্যাফও এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। পরিযায়ী পাখিদের বিচরণভূমি এমননিতেই সংকীর্ণ। যেটুকু আছে তাকে নিরাপদ রাখতে তাঁরা সচেষ্ট। বনবিভাগ, পর্যটন দপ্তর, পুলিশ ও প্রশাসন তো কড়া নজর রাখছেনই তবে এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও সাধারণ মানুষেরও সক্রিয়তা দরকার।

গাজলডোবায় পর্যটনকেন্দ্র গড়ার কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। শিগগিরি হট এয়ার বেলুনে চেপে মহড়া দেওয়া হবে। জানুয়ারিতেই উদ্বোধন করার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। এদিকে গাজলডোবা হল মাইগ্রেটরি বার্ডসের ঘাঁটি। নর্দার্ন ল্যাপউইংয়ের মতো পাখিরা অকাতরে উড়ে বেড়ায় তিস্তাপাড়ের এই আকাশে। গত বছর ‘বিন গুজ’ নামে বিরল এক পরিযায়ী হাঁসের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। নজরে পড়েছিল ব্রাহ্মণী হাঁস। সেখানে হট এয়ার বেলুন চেপে মানুষেরা উড়ে বেড়ালে বা নৌকাবিহার করলে পাখিদের কি অসুবিধে হবে না? তারা কি শান্তি বিঘ্নিত হলে ঠিকানা বদল করে নেবে না? সে কারণেই এ ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করছেন পরিবেশবিদদের একাংশ। যদিও পর্যটন দপ্তর জানাচ্ছেন তাঁরা পরিবেশবান্ধব পর্যটন কেন্দ্র গড়ার জন্য প্রতি পদক্ষেপে পরিবেশগত সমীক্ষা করছেন।

গাজলডোবায় ব্যারেজের ধারে সার দেওয়া ধূলিধূসরিত দোকান। সেখানে চা-বিস্কুট-চিপস ইত্যাদি পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় তিস্তার টাটকা বোরোলি মাছ। বছর বিশেক আগে যখন আসতাম তখন এদিকটা জনবিরল ছিল। এখন লোকে লোকারণ্য। ডুয়ার্স ঘুরতে আসা পর্যটকদের লিস্টে ঢুকে গিয়েছে ভ্রামরী দেবীর জাগ্রত মন্দির। সেই সঙ্গে তালিকায় এনলিস্টেড হয়েছে গাজলডোবা ব্যারেজ। শীতের

সময়পরিযায়ী পাখিদের দেখতে দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন পর্যটক।

পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে ডুয়ার্সের সৌন্দর্যরেখা তিস্তা। তিস্তার বোরোলির স্বাদের কথা সর্বজনবিদিত। ভোজনরসিকরা মনে করেন গাজলডোবায় এসে বোরোলি মাছের ভাজা দিয়ে চা না খাওয়াটা অন্যায়। সম্ভবত এই পেটপুজোয় বেশ খানিকটা পুণ্যও সঞ্চয় করা যায়। আমরাও গাজলডোবায় এলে প্রকৃতির শোভা দেখার পাশাপাশি নিজেদের লেজার অ্যাকাউন্টে খানিকটা করে পুণ্য ডেবিট করে যাই। এবারও তার অন্যথা হল না।

মাছভাজা দিয়ে চা খেতে খেতে স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। দু'-একজন রাজনীতির মানুষও ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গেল। পর্যটন ভিত্তিক কর্মসংস্থান বাড়াতে রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গে প্রথম হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু করতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের মেগা টুরিজম হাবের কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে। টুরিজম হাবের প্রাথমিক কাজ শেষ হচ্ছে নতুন বছরে। সেখানে যুব আবাস ও পর্যটন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে দিল্লির একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে পিপিপি মডেলে এই ম্যানেজমেন্ট কোর্স পড়ানো হবে। পর্যটন নির্ভর উত্তরবঙ্গে হোটেলের সংখ্যা প্রচুর। শিলিগুড়িতেই তিনশোর বেশি ছোট-বড় হোটেল আর রেস্তোরাঁ আছে। ডুয়ার্স বা পাহাড়ের হোটেলের এর সঙ্গে যোগ করলে তো কথাই নেই। দেশ বিদেশের বহু পর্যটক আসেন এসব দিকে বেড়াতে। কিন্তু দেখা যায় অধিকাংশ হোটেলে দক্ষ প্রশিক্ষিত কর্মী নেই। ফলে এদিকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু হলে কর্মসংস্থানের যে ব্যাপক প্রসার ঘটবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ডুয়ার্সের বহু ছেলেমেয়েই এখান থেকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স করে প্রশিক্ষিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। হোটেল কর্তৃপক্ষও সেক্ষেত্রে হাতের নাগালে দক্ষ প্রশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের পেয়ে যাবেন।

চা খেতে খেতে কথা বলছিলাম আমরা। তার মধ্যেই মাছভাজার গন্ধ ছাপিয়ে নাকে এল অন্যরকম এক সুবাস। চিনে নেওয়া গেল গন্ধটাকে। এ তো নলেন গুড়ের গন্ধ! ডুয়ার্সবাসীর কাছে শীত মানে ভুটান আর দার্জিলিংয়ের মধুর মতো মিস্টি কমলালেবু। শীত মানে নতুন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা। শীত মানে পায়েস আর পিঠেপুলি। তবে খাঁটি নলেন গুড় ছাড়া সে জিনিস জমে না। অথচ বাজারে যে গুড় মেলে তার মধ্যে নলেন গুড়ের সেই মন কেমন করা গন্ধটাই তো এখন আর নেই। আসল যে একেবারেই বিকোয় না তা নয় তবে ভেজালের ভিড়ে আসল চিনে নেওয়াই দায়। বাঙালির পৌষ পার্বণ উৎসবও যেন খানিকটা মিইয়ে পড়েছে খাঁটি নলেন গুড়ের অভাবে! প্রবীণ মানুষেরা বাজারে পাওয়া গুড় হাতে ধরে নাকের কাছে ঘ্রাণ নিয়ে আফশোস করে বলেন কোথায় সেই স্বাদ! কোথায় সেই গন্ধ! পুরনো দিনের স্মৃতিজড়ানো সেই গুড় আর কোথায়! খাঁটি গুড় যদি না পাওয়া যায় তাহলে কীভাবে জমবে পিঠেপুলি? কিন্তু ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে গাজলডোবায় এসে সেই স্মৃতিজাগানিয়া গন্ধ নাকে এসে রীতিমত চমকে দিল। কোথা থেকে আসছে এই ঘ্রাণ?

ডিটেকটিভের মতো নেমে পড়লাম সন্ধানে। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। একটু এগোতেই সন্ধান পাওয়া গেল সেই কাঙ্খিত জিনিসটির। সকাল থেকে গনগনে উনুনে পাক দিচ্ছে রস। ধীরে ধীরে সেই বর্ণ ধরছে রসে। নতুন খেজুর গুড়ের গন্ধে মাতোয়ারা চারদিক। ভিনদেশি কারিগরদের হাতে তৈরি খেজুর গুড়ের পাটালি ও নলেনের স্বাদে পৌষ পড়ার আগেই যেন বাঙালির 'পৌষালি উৎসব' শুরু হয়ে গিয়েছে তিস্তাপাড়ে। বাংলাদেশের রাজশাহীর বাগা এলাকায় কামাল হোসেন, আবদুল রহিম, কামরুল ইসলামদের সঙ্গে দেখা হল তিস্তাপাড়ে এসে। এঁদের হাতের জাদুতেই এখন গাজলডোবা অঞ্চল দিয়ে তিস্তাপাড়ে এখন ম' ম' করছে নলেন গুড়ের সুবাস।

আলাপ হল কামরুলদের সঙ্গে। জানা গেল ভোজনরসিকদের রসনায় তৃপ্তি আনতেই ওপার বাংলা থেকে চলে এসেছেন কারিগররা। গত বছরও এসেছিলেন ওঁরা। কিন্তু নোটবন্দির জন্য ব্যবসা হয়নি তেমন। লাইন দিয়ে বহু কষ্টে অর্জিত টাকা প্রাণে ধরে খরচ করতে পারেননি মানুষ। কিন্তু এবার পরিস্থিতি আলাদা। এবার প্রথম থেকেই বাজার একেবারে চাঙ্গা। চাহিদাও দিব্যি। আমাদের কৌতূহলের জবাবে আবদুল রহিম জানালেন, গত তিন মাস ধরে ওঁরা ডুয়ার্সের গ্রামে গ্রামে নাকি ঘুরেছেন। তল্লাশ করেছেন খেজুর গাছের। শ' তিনেক গাছ লিজ নিয়েছেন তাঁরা। গাছ প্রতি মালিক পাবেন দু'কেজি করে খাঁটি খেজুর গুড়। যদি কোনও রক্তে শর্করা ধরা গেরস্ত গুড় নিতে না চান? তিনি পাবেন গাছ প্রতি দুশো টাকা।

কীভাবে তৈরি হচ্ছে এই নস্টালজিয়া উসকে দেওয়া নলেন গুড়? একটু এগিয়ে দেখা গেল টিনের ছাউনি দেওয়া ঘরে সারি দিয়ে মাটির হাঁড়ি। তাতেই প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা পাক দেওয়া রস। অর্ডার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পাইকাররা। ফলে দম ফেলার ফুরসত নেই রহিমদের। দশ লিটার রস পাঁচ ঘণ্টা ধরে আগুনে জ্বাল দিয়ে এক কেজি গুড়ের উপাদান পাওয়া যায়। কামরুলরা বংশ পরম্পরায় এই কাজ করে আসছেন। বানিয়ে আসছেন খেজুর গুড়। দুটো পয়সা আয় করার জন্য ভিসা, পাসপোর্ট বানিয়ে গাজলডোবায় এসেছেন সেই বাংলাদেশের রাজশাহী থেকে।

কী বলছেন অমৃতের আস্বাদ নেওয়া মানুষজন? জানা গেল নলেন গুড়ের খোঁজ পেয়ে ক্রেতাদের অনেকেই সকাল বিকেল ঢুঁ মারছেন তিস্তা নদীর পাড়ে। মুগ্ধ হয়ে দেখছেন গুড় তৈরির কৌশল। চোখের সামনে এমন প্রাণকাড়া জিনিস দেখে চেখে দেখার লোভ সামলানো গেল না। দাম আহামরি নয়। দেড়শো টাকা। বেশি নিলে একশো তিরিশ টাকাতেও পাওয়া যাচ্ছে।

একটু ভেঙে মুখে দিলাম। কী আশ্চর্য, মুখে দিতেই গলে জল হয়ে গেল সেই গুড়। শুধু আমরা নই খাঁটি নলেন গুড় চাখতে ভিড় জমিয়েছেন আবালবৃদ্ধবনিতা। স্থানীয় বাসিন্দারা তো আছেনই গঙ্গার ওপারের মানুষজনও রয়েছেন প্রচুর। কেউ এসেছেন কালীঘাট থেকে, কেউ কুঁদঘাট, কেউ কেষ্টপুর। কিন্তু সকলেই একমত। এমন মিষ্টি গুড় তাঁরা জীবনে এই প্রথমবার খেলেন। মানুষগুলোর তৃপ্ত মুখ দেখে ভাল লাগছিল। তাঁরা চাখছেন, বাড়ির জন্য গুড়ের চাকা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন হৈ হৈ করে।

বড় করে শ্বাস নিলাম কয়েকবার। খাঁটি নলেন গুড়ের ঘ্রাণ নিতে নিতে কামরুলদের ব্যস্ততা দেখছিলাম। খুশিতে চিকচিক করছে মুখগুলো। ভিনদেশী এই প্রান্তিক মানুষগুলোর অনাবিল আনন্দ আমাদেরও আনখশির ছুঁয়ে যাচ্ছিল। শীতসন্ধের গুঁড়ো লেগে থাকা তিস্তা ছোঁয়া ভেজা হাওয়ারই মতো।

ভিনদেশি কারিগরদের হাতে তৈরি খেজুর গুড়ের পাটালি ও নলেনের স্বাদে পৌষ পড়ার আগেই যেন বাঙালির 'পৌষালি উৎসব' শুরু হয়ে গিয়েছে তিস্তাপাড়ে। বাংলাদেশের রাজশাহীর বাগা এলাকায় কামাল হোসেন, আবদুল রহিম, কামরুল ইসলামদের সঙ্গে দেখা হল তিস্তাপাড়ে এসে। এঁদের হাতের জাদুতেই এখন গাজলডোবা অঞ্চল দিয়ে তিস্তাপাড়ে এখন ম' ম' করছে নলেন গুড়ের সুবাস।

এখন ডুয়ার্স প্রকাশিত বই

পর্যটনের বই

চা-শিল্পের বই

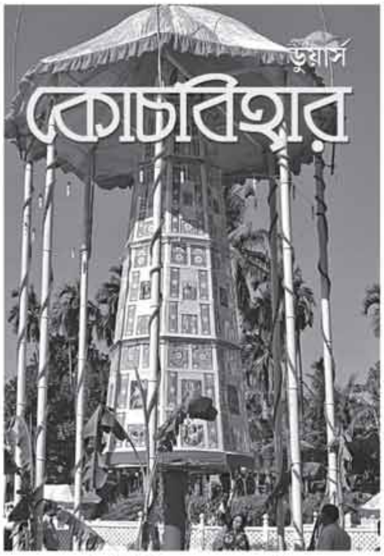

কোচবিহার। মূল্য ২০০ টাকা

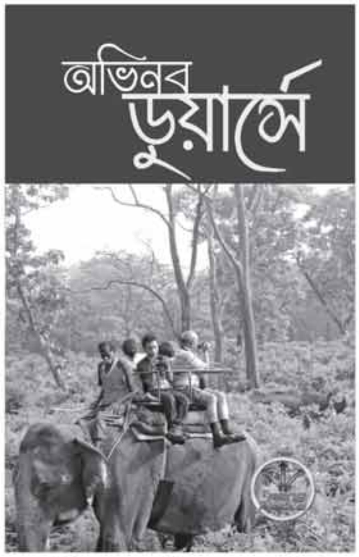

অভিনব ডুয়ার্সে। মূল্য ২০০ টাকা

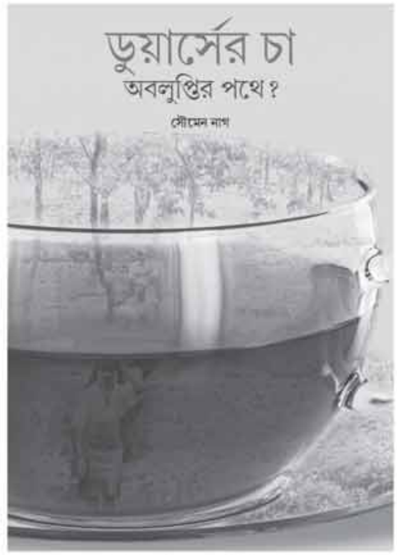

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

সাহিত্যের বই

চারপাশের গল্প
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন
মূল্য ১০০ টাকা

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

সবক'টি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান

আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

জটিলেশ্বরের আশপাশে

হুসলুডাঙ্গা বাস স্টপে নামলাম যখন খুব ধুলো চারদিকে। ভারি ভারি একগুচ্ছ ট্রাক মহানন্দে 'হোলি হ্যায়' বলতে বলতে চলে যাচ্ছিল যেন। স্টপ লাগোয়া চপের দোকানে সে ধুলোর খানিকটা ঢুকে গিয়ে আশ্রয় নিল ভাজাগুলোর শরীরে। স্বাদ বেড়ে গেল ওদের।

হুসলুডাঙ্গা হলো ধূপগুড়ি আর ময়নাগুড়ির মাঝখানে। বিখ্যাত ঝাঝাঙ্গি ধাবা থেকে গাড়িতে পাঁচ মিনিট। এখান থেকেই জটিলেশ্বর মন্দিরে যাওয়ার স ংক্ষিপ্ত রাস্তাটি মেলে। টোটো আর রিক্সাভ্যান পাওয়া যায়। খানিকটা এগোলেই হুসলুডাঙ্গা হাট। এইসব হাটের সেরা সময় হলো সন্ধেবেলা। তখন মাঠজুড়ে বসা পসারিরা সামনে একটা করে হলুদ বালব জ্বালিয়ে দেয়। তারমধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে বাজার করাটা বেশ রোমান্টিক। সব হাটের কমন জিনিস হলো মোমো আর চাউমিনের দোকান। দু-বছর আগে একটা পূর্ণিমা সন্ধ্যায় আমি এই হাটে বাজার করেছিলাম।

এবার যখন বাস স্টপে ধূলিপুষ্ট আলুর চপ আর চা খেয়ে টোটোয় চাপলাম, তখন ভরা দুপুর। হাটবার নয়। দৈনন্দিন বাজারের অংশটা ঝিমোচ্ছিল। আমন ধান কাটার পালা প্রায় শেষ। কাটা ধান গোছা গোছা হয়ে পড়ে আছে কোনও কোনও খেতে। কোনও খেত ভরা কেবল ধানগাছের গোড়া। কিছু খেত চষা। কয়েকটায় তেড়ে হাল লাগান ট্রাকটর চলছে।

বাস স্টপ থেকে জটিলেশ্বর মন্দির যেতে আহামরি কিছু নেই পথের দু-ধারে। কিন্তু একটা শান্ত শান্ত ভাব আছে। একটা প্লাইউড কারখানা নজরে আসে। তারপর ঘরবাড়ি, দোকানপাট। ফাঁক দিয়ে পুকুর আর মন্দির চোখে পড়ে। বাঁ দিক থেকে একটা রাস্তা প্রাইমারি স্কুলের সামনে দিয়ে এসে আমাদের পথকে ক্রস করে ডান দিকে চলে গেছে। সে পথে কয়েক কদম হাঁটলেই মন্দিরের গেট। জটিলেশ্বরে না ঢুকে সোজা চার-পাঁচ কিলোমিটার চলে গেলে জল্পেশ পৌঁছে যাবেন।

আমি ঠিক মন্দির দেখতে আসি নি। জটিলেশ্বরে এই নিয়ে আমি হয় তো বারোবার যাচ্ছি। অথবা দশবার। অধিকাংশ দিন মন্দিরে ঢুকি নি। কিন্তু যেদিন ঢুকেছিলাম, বেশ মন দিয়ে মন্দির দেখেছি।

মন্দিরের পথে না ঘুরে সোজা চলে গেলে সাপ্টিবাড়ি। সেখান থেকে রানীর হাট হয়ে জামালদহ একদিকে। আরেক দিকের রাস্তা গুয়াবাড়ি, সুস্তিরহাট, পানিশালা। আমি অবশ্যি পানিশালা যাই নি কখনও। একবার গুয়াবাড়ি আর সুস্তির হাট দেখেছি। রানীর হাট হয়ে জামালদহ গেছি কয়েকবার। সাপ্টিবাড়িতে হাইস্কুল আছে। জনঘনত্ব বেশ কম।

টোটো চলছে। বিস্তির্ণ খেত, ছোট ছোট জলাজমি, গাছপালায় ঘেরা জীর্ণ বাড়িঘর। কখনও দালান এক আধটা। অঘ্রানের মাঝামাঝি দুপুর বেলায় রোদের তেজ মন্দ নয়, কিন্তু ছায়ায় এলেই একটা শিরশিরে ভাব টের পাওয়া যায়। টোটোর সহযাত্রী সাদা ধুতি আর ফতুয়া পরে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন। গলার মালা দেখে বুঝলাম বিষ্ণু ভক্ত। ভজন- কীর্তনের আসরকে রাজবংশীরা বলেন 'গান'।

আমি তাকে চষা মাঠ দেখিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'এবার কী বুনবে? আলু?'

'বেশির ভাগ তো আলুই করবে।' তিনি যেন চোখ বুঁজে প্রশ্নটার জন্য তৈরী হয়ে ছিলেন।

'বাকিরা?'

'বেগুন করবে। পুঁইশাক। আমি তো পুঁই করব এবার।'

'কতটা জমি?'

'এই তিন পোয়ার মত। জমি তো আমার বেশি নাই। এই ধরেন বাড়ির খাবার মত ধান হয়। ছেলে কেরালায় লেবারের কাজ করে।

মেয়ে পড়ে ইসকুলে। একশো দিনের কাজ করি।'

হুসলুডাঙ্গা মোড় থেকে সুপ্তির হাট কি রানীর হাট— ছড়িয়ে থাকা জনপদগুলির সিংহভাগের জীবন কয়েকটা বাক্যে যেন গোঁসাইজী শুনিয়ে দিলেন। একটু কোমরের জোর থাকলে আলু, নয় তো বেগুন-পুঁই-বাঁধাকপি। একশো দিনের কাজ থেকে খানিকটা নগদ আয়। ঘরে সমর্থ ছেলে থাকলে কেরলে শ্রমিক। ভুটানেও যায় অনেকে, কিন্তু সেখানে কাজ করতে যাওয়া রিস্কি। বিপদজনক সব কাজ। চোট পেলে নিয়োগ কোম্পানি হাতে সামান্য নগদ ধরিয়ে দিয়ে ঘটনাটা চেপে দেবে।

এই গতবাঁধা জীবনধারার মধ্যেই হঠাৎ দু-পাঁচ জন 'দেউনিয়া' হয়ে ওঠে কী ভাবে, সেটা গোঁসাইজি জানেন না।

বস্তুতঃ গোঁসাইজীর বাক্যগুলি কমবেশি গোটা ডুয়ার্সের বাক্য। ডুয়ার্সের সব জায়গা পর্যটনযোগ্য নয়। সব জায়গায় চা বাগান নেই। সাপ্টিবাড়ি-সুস্তির হাটে কোনও বাস যায় না। অটো চলে কয়েকটা ময়নাগুড়ি পর্যন্ত।

আমি এবার গোঁসাইজীকে বললাম, 'গান হচ্ছে না?'

এবার তিনি প্রসন্ন মুখে হাসলেন। চোখটা পুরো খুলল। আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'আমার দল আসে। আমি গাই। এবার একটা হারমোনিয়াম কিনব।'

'পুঁইশাক বিক্রি করে?'

'না না।' তিনি হাসলেন। 'ধরেন দেড় কেজির মত যদি গাঁজা করতে পারি তালে হারমোনিয়ামটা হয়ে যাবে।'

'ও আচ্ছা!' আমি একটু থতমত খেলাম। গাঁজা চাষ ডুয়ার্সের গ্রামে অল্প স্বল্প অনেক বাড়িতেই হয়। কিন্তু কনঠি পরা বিষ্ণুভক্তের মুখে এ বাক্য আমি আশা করি নি। বললাম, 'সে কী! আপনি না বৈষ্ণব?'

'তাতে কী? এটা তো বাবার প্রসাদ।' বলে একটা প্রণাম ছুঁড়লেন। দেখলাম জটিলেশ্বরের ক্যাম্পাস দেখা যাচ্ছে।

জটিলেশ্বরের পুরোহিত অবশ্য বাঙালি নন। বারাণসীর পুরোহিতদের সুরে শিবের স্তুতি করে হাতে চরণামৃত ঢেলে দেন। জল্পেশের মত জটিলেশ্বরও মাটির খানিকটা নিচে থাকেন। চাল-ডাল ইত্যাদি কিনে পারিশ্রমিক দিয়ে দিলে পুরোহিতের লোকজন ভোগের জন্য খিচুড়ি বানিয়ে দেয়। সেটা খেতে চমৎকার। লাগোয়া পুকুরটা বড়ো। তাকে অনায়াসে একটা ছোটখাট দিঘি বলা চলে। দিঘিতে মাছধরা নিষিদ্ধ, কিন্তু আমি দেখলাম আপিসবাবুর পোষাকে একজন ছিপ দিয়ে মাছ ধরছেন। দিঘির পাশে দাঁড়িয়ে আমি ইচ্ছে করেই জোরে জোরে পাশে দাঁড়ান লোকটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম, 'দিঘিতে এখন তবে মাছ ধরা যাচ্ছে?'

ছিপধারী চমকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, 'আমি গর্মেন্টের হয়ে ধরছি।'

সরকারী কাজকর্মের শুনেছি অনেক বৈচিত্র্য থাকে। সম্ভবতঃ ছিপ দিয়ে মাছ ধরারও কোনও দপ্তর থেকে থাকবে। তবে জটিলেশ্বরের কাছে এসে এইসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও মানেই হয় না। তাই অদূরবর্তী প্রাইমারি ইশকুলটার দিকে তাকালাম। মিড ডে মিল সবে শেষ হয়েছে। কেএলও জঙ্গীদের বাড়াবাড়ির দিনে এই স্কুলের ক্যাম্পাসে পুলিশ ক্যাম্প বসান হয়েছিল। সেটা দেখলাম নেই। ভালোই হয়েছে। শিশু আর বন্দুক একসঙ্গে থাকা উচিত নয়।

বছর দশেক আগে এক সরস্বতী পুজোর দিন শিক্ষক দেবাশিস কুন্ডুর সৌজন্যে আমি এই স্কুলে মিড ডে মিল খেয়েছিলাম প্রসাদ হিসেবে।

হাঁটতে থাকি। সূর্য ঢলে যাচ্ছে। হিমেল ভাব চলে আসছে বাতাসে। সামনেই গানের আসর বসবে আজ। শুরু হবে হয় তো রাত দশটায়। কিন্তু মাঠ ঘিরে দোকানিরা প্রায় রেডি। ডিজে মার্কা বক্সে গুম গুম করে বাজছে একালের সুপার হিট ভক্তিগীতি 'এই হরিনাম তুমি গাইবে কবে—'। টোটোর সহযাত্রীকে দেখলাম কাঁধে শ্রীখোল ঝোলান এক যুবককে কিছু বোঝাচ্ছেন। পঞ্চায়েতের এক যুবক নেতা বাইক নিয়ে আমার সামনে থামলেন। তাঁর তুতো বোন আমার ছাত্রী ছিল বলে দেখা হলেই সিগারেট খাওয়ায়।

ধোঁয়া উড়িয়ে গানের প্যান্ডেলের দিকে ইশারা করে বললাম, 'সব ঠিকঠাক?'

সে ওদিকটা একবার দেখে নিয়ে বলল, 'রাতে থাকেন সার। গান কিন্তু আমরাই আনছি।'

না। থাকা হয় নি।

ঘণ্টাখানেক পর যখন মন্দিরের দিকে ফিরছি তখন অন্ধকার। টোটো বা রিক্সাভ্যানের আশায় তখন একটা ফাঁকা জমির পাশ দিয়ে আসতে আসতে মনে হলো, আরে! এখানেই তো সখিন রায়ের বাড়ি। তাঁর বাড়িতে একটাই কমলা গাছ এবং সে গাছে কমলা ফলে শ তিনেক।

হুসলুডাঙ্গা স্টপে আসতেই ধূপগুড়িগামী বাস থামল একটা। স্কুলের পোষাকে একটা ছাত্রী নামল ব্যাগ কাঁধে নিয়ে। চেনামুখ। আমাকে দেখে একগাল হেসে বলল, 'কী মেসো! কেমন আছো?'

'ছ-টার সময় ফিরছিস যে?'

'একবারে প্রাইভেট পড়ে ফিরলাম।'

মনে পড়ল ওর বাড়ি সুস্তির হাটের কাছে। টোটোয় বা ভ্যান রিকসায় যাবে না। অপেক্ষা করবে অটোর জন্য। তাহলে পাঁচ টাকা ভাড়া কম পড়বে।

হুসলুডাঙ্গা স্টপ থেকে সুস্তির হাট পর্যন্ত রাস্তাটা সন্ধের পর ভারি ভূতুড়ে হয়ে যায়। কিন্তু এখনও মানুষভূতেরা জাগে নি এদিকে। মেয়েটা তাই ঠিক ঘরে পৌঁছে যাবে। অটো আসুক, বা না আসুক।

এইখানেই জিতে গেল জায়গাটা।

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

বর্ষশেষে একটি বিকেল

আয়োজনে মুজনাই সাহিত্য পত্রিকা

মুজনাই সাহিত্য পত্রিকার ব্যবস্থাপনায় ও উত্তর ভূমিকার সহযোগিতায় ২২ ডিসেম্বর, শুক্রবার, কোচবিহারের সাহিত্য সভায় অনুষ্ঠিত হল 'বর্ষশেষে একটি বিকেল' শীর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাট্যব্যক্তিত্ব পূর্বাচল দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে এই সাংস্কৃতিক বিকেলে প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন উত্তর প্রসঙ্গের সম্পাদক দেবব্রত চাকী। আধুনিক কবিতা ও ছোটগল্পের রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করলেন অধ্যাপক জয়দীপ সরকার, কবি-সম্পাদক গৌরাঙ্গ সিনহা, শিক্ষক অঞ্জন মুখার্জি এবং সমকালের নিরিখে উত্তরবঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন কবি মানিক সাহা। এই মঞ্চেই প্রকাশ পেল গৌরাঙ্গ সিনহা সম্পাদিত 'উত্তর ভূমিকা' পত্রিকার উৎসব সংখ্যা। কবিতা ও গল্প পাঠে অংশ নিলেন কবি সুবীর সরকার, শিউলি চক্রবর্তী, মুজনাই সাহিত্য সম্পাদক ও লেখক শৌভিক রায় প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন কিশোরনাথ চক্রবর্তী, গৌতমী ভট্টাচার্য ও চঞ্চরিকা ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সিস্টার নিবেদিতা গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীদের অভিনীতি একাঙ্ক নাটক 'সবুজ উড়ান'। নাটকটি ইতিমধ্যেই কলকাতার অনীক নাট্য উৎসবে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার পেয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

এখন ডুয়ার্স-এর নতুন বই

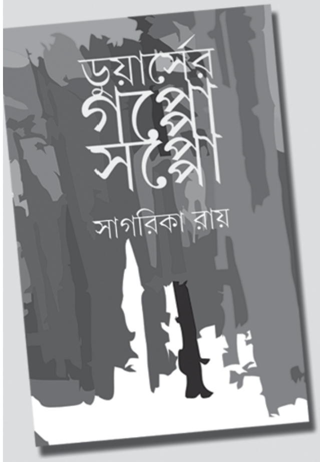

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো

সা গ রি কা রা য়

এক মায়াময় জগত ডুয়ার্স, যার সঙ্গে লেখিকার নাড়ীর বন্ধন। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গেই তাঁর চেতনার রঙে জারিত হয়ে ফুটে ওঠে ডুয়ার্সের নানা চিত্রকল্প। কলকাতার একটি বড় দৈনিকের রবিবারের পাতায় একসময় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া চৌত্রিশটি গল্পের সংকলন। প্রকাশিত হল। **দাম ১৫০ টাকা।**

প্রকাশিত হতেই সাফল্য

চায়ের ডুয়ার্স কী চায়?
গৌতম চক্রবর্তী

গত এক বছরে ডুয়ার্সের চা-শিল্পের পরিস্থিতি, উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, সরেজমিনে বাগান ধরে ধরে ঘুরে দেখে তা ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকার পাতায়। অবনতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণগুলি যেমন ধরা পড়েছে, সেই সঙ্গে চায়ের দূরবস্থার সুযোগ নিয়ে গড়ে উঠছে যে বিশাল মাফিয়া চক্র, তারও ইঙ্গিত মিলেছে বহু জায়গায়। এই সংকলনে ধরা পড়েছে এক অবিশ্বাস্য যুগ। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে এই বইটি সাড়া জাগাবে কোনও সন্দেহ নেই। **১১০ টাকা**

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি
দেবপ্রসাদ রায়

রাজনীতির চর্চার পটভূমি একদিন বদলে গেল। পরিস্থিতির চক্রে ডুয়ার্স থেকে দিল্লিতে পৌঁছে গেলেন। ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লেন জাতীয় রাজনীতির আঙিনায়। সঞ্জয় গান্ধী হয়ে ইন্দিরা গান্ধী, তারপর রাজীব গান্ধীর বিশ্বস্ত সহচর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। দলের হয়ে দেশের নানা প্রান্তে কাটাবার অভিজ্ঞতা হল, পৃথিবীর নানা দেশে যাওয়ার সুযোগও। দীর্ঘ ২৬ বছরের উত্তরবাংলা, কলকাতা হয়ে দিল্লি তথা গোটা দেশের রাজনীতির ছবি ধরা পড়েছে জনপ্রিয় নেতার কলমে। **১৫০ টাকা**

পাওয়া যাচ্ছে: কলকাতা - দেজ পাবলিশিং ও অক্সফোর্ড। জলপাইগুড়ি - আড্ডাঘর, মার্চেন্ট রোড

কোচবিহার বইমেলা ৪-১১ জানুয়ারি

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-17 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-১৭। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.